অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, গীতা যে নিষ্কামতার শিক্ষা দিয়াছে, ইহা সংসারী মানুষের জন্য উপযোগী নহে, যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিবে কেবল তাহাদের পক্ষেই গীতার এই উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভব। বাসনা কামনার তৃপ্তি লইয়াই মানুষের জীবন, সেই তৃপ্তিই যদি পরিত্যাগ করিতে হইল, তাহা হইলে আর জীবনে থাকিল কি? কাম ক্রোধাদির বেগের বশেই মানুষ কর্ম্ম করে। যদি কাম ক্রোধ নির্ম্মূল হইয়া যায় তাহা হইলে মানুষ কর্ম্ম করিবে, সংসার ধর্ম্ম পালন করিবে কিসের প্রেরণায়? কিন্তু গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই এই সব প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। [1]বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শে যে সুখ বা আনন্দ পাওয়া যায় সে-সবই যে পাপ বা বর্জ্জনীয়, গীতা তাহা বলে নাই, যদিও অনেক নীতিবিৎ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনরূপ সুখ ভোগ করাটাই অন্যায়, পাপ, উচ্চতর অধ্যাত্ম জীবন লাভের পরিপন্থী। সুমিষ্ট খাদ্য আস্বাদন করিয়া, সুগন্ধ পুষ্প আঘ্রাণ করিয়া, শ্রুতিমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, সুন্দর চিত্র বা সুন্দরী রমণী দেখিয়া চিত্তে যে আনন্দের উদয় হয় তাহাতে কোন পাপই নাই, তাহাতে আত্মার কোন ক্ষতিই হয় না, বরং এই সব আনন্দের ভিতর দিয়াই আমরা আত্মোপলব্ধির দিকে অগ্রসর হই, কারণ আমাদের আত্মা হইতেছে আনন্দময়, আনন্দই তাহার স্বরূপ, রসো বৈ সঃ। আর বাহিরের যে বস্তুতে আমরা আনন্দ পাই তাহাও ভগবানেরই বিভূতি; গীতায় ভগবান বলিয়াছেন সংসারে শ্রীসম্পন্ন সৌন্দর্য্যময় যাহা কিছু দেখিবে সে-সব তাঁহারই বিভূতি, তাঁহারই তেজ হইতে উদ্ভূত,

> যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
> তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥
>
> গীতা—১০।৪১

সংসারের সব কিছুতেই ভগবান রহিয়াছেন, সকল বাহ্য স্পর্শেই আমরা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারি, কিন্তু সাধারণ মানবের চৈতন্য অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে, তাই সে সর্ব্বত্র এই উপলব্ধি পায় না। যেখানে ভগবানের শক্তির বিশেষ প্রকাশ, যে-সব বস্তু বিশেষভাবে সুন্দর, সুশ্রী, আনন্দপ্রদ—সেই সবেই সে ভগবানের কিছু আভাস পায়, স্পর্শ পায়, তাই সে সেই-সব বস্তুতে আনন্দ লাভ করে—অতএব ইহাতে পাপ বা দোষাবহ কিছুই নাই। কিন্তু অজ্ঞান

১

ও অহংভাবের বশে সে নিজেকে এই সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে, সেই সবকে নিজের ক্ষুদ্র অহংয়ের তৃপ্তির জন্য ধরিয়া রাখিতে চায়, নিজের অজ্ঞ ধারণা অনুযায়ী ভোগ করিতে চায়, ব্যবহার করিতে চায়—এইভাবে তাহার মধ্যে যে কামনার বেগ উদ্ভূত হয় তাহাতে তাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়, মোহ উৎপন্ন হয়, আত্মস্মৃতি নষ্ট হয়, সে হিতাহিত শুভাশুভ জ্ঞানশূন্য হয় এবং এই ভাবেই পাপে লিপ্ত হয়। অতএব এই বেগকে সংযত করিয়া শান্তভাবে সংসারের যে কোন ভোগ-সুখ ইন্দ্রিয়-সুখ গ্রহণ করা হউক না কেন তাহাতে পাপ হয় না।

গীতা যে ভোগ-সুখ বর্জ্জন করিতে বলে নাই শুধু তাহাই নহে, গীতা স্পষ্টভাবে ভোগের নির্দ্দেশ দিয়াছে, অর্জ্জুনকে বলিয়াছে, "যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গে যাইবে, জয়ী হইলে এই পৃথিবীকে ভোগ করিবে, অতএব দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত যুদ্ধ কর।" গীতা অবশ্য বলিয়াছে যে, ইন্দ্রিয়সংস্পর্শ হইতে যে ভোগ উৎপন্ন হয়, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে তৃপ্তি পান না; কিন্তু তাহার কারণ হইতেছে তিনি চান নির্ম্মল সুখ; আর ইন্দ্রিয়-সুখের সহিত দুঃখ জড়িত হইয়া রহিয়াছে, দুঃখযোনয় এব তে। কিন্তু সে-জন্য ঐসব ভোগ-সুখ বর্জ্জন করা গীতাব শিক্ষা নহে, ঐ সব সুখের সহিত যে দুঃখ জড়িত রহিয়াছে তাহার মূল উৎপাটন হইতেছে ঐ করিয়া নির্ম্মল সুখ ভোগই গীতার শিক্ষা। কাম ক্রোধের বেগ দুঃখের মূল, তাই গীতা ঐ বেগকে সংযত করিবার উপদেশ দিয়াছে।

কিন্তু কামক্রোধের বেগ না থাকিলে মানুষ আদৌ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে কেন? সুখের কামনা যদি না রহিল তাহা হইলে মানুষ কেন সুখের সন্ধান করিবে? নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম, অনাসক্তভাবে ভোগ—এসব কি স্ব-বিরোধী নহে? মানব প্রকৃতিতে কি ইহা সম্ভব? সাধারণ মানুষ সকাম কর্ম্মেই অভ্যস্ত, কামনার পরিতৃপ্তিতে যে সুখ শুধু তাহার মর্ম্মই সে ভাল রকমে বুঝে, তাই নিষ্কাম কর্ম্ম ও অনাসক্ত ভোগ তাহার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা অজ্ঞান, মোহ—এই মোহ ও অজ্ঞান দূর করাই গীতা-শিক্ষার লক্ষ্য। নিষ্কাম কর্ম্ম যদি অসম্ভব হয় তাহা হইলে সমস্ত গীতার শিক্ষাই ব্যর্থ হইয়া যায়। নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ নহে যে, কর্ম্মের কোন লক্ষ্য থাকিবে না, উদ্দেশ্য থাকিবে না। কর্ম্মের অর্থই হইতেছে কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধি; উদ্দেশ্য না থাকিলে অবশ্য

কোন কর্ম্মই হইতে পারে না। কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করিব সেটা যদি আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ লাভ লোকসান হিসাব করিয়া নির্দ্ধারণ করি তাহা হইলেই সেইটি হয় সকাম কর্ম্ম। প্রশ্ন উঠিবে, মানুষ নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিবে না, শুধুই পরের জন্য সর্ব্বদা নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম্ম করিবে—ইহাই কি গীতার শিক্ষা? তাহা হইলে সংসার চলিবে কেমন করিয়া? বস্তুতঃ ইহাও গীতার শিক্ষা নহে—গীতায় অর্জ্জুনকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করিতে বলা হয় নাই, ভগবান বলিয়াছেন, "যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য উপভোগ কর।" ইহা বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থপরতা নহে। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কামনা লইয়া যেমন কর্ম্ম করা চলিবে না, তেমনি নিজের স্বার্থসিদ্ধি হইবে, ভোগসুখ হইবে বলিয়া কোন কর্ম্ম যে বর্জ্জন করিতে হইবে এমনও কোন কথা নাই। বস্তুতঃ গীতার শিক্ষার সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে, কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে না হইবে সেটা নিজের ক্ষুদ্র অহংভাব লইয়া বিচার করিও না, নিজের সুখ দুঃখ বিচার করিয়া কর্ম্ম করিও না, দেখিবে কোন্ কর্ম্মটি তোমার কর্ত্তব্য, ভগবান তোমার নিকট হইতে কোন্ কর্ম্ম চান, সেই কর্ম্মটিই সুচারুভাবে, ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে করিবে—ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম, সংসারের সকল লোক সকল অবস্থাতেই এই নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা করিতে পারে এবং ইহাই প্রকৃত সুখ ও শান্তিলাভের পন্থা।

অনেকেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিতে, যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ করিতে বলা হইয়াছে, কারণ তিনি ক্ষত্রিয় এবং কর্ম্ম ও ভোগের অধিকারী। দুইটি মার্গ আছে, প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ। অর্জ্জুন প্রবৃত্তি মার্গের অধিকারী বলিয়াই তাঁহাকে কর্ম্ম ও ভোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ গীতা কোথাও এইভাবে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এইরূপ দুই মার্গের ভেদ করে নাই। আর গীতার শিক্ষা শুধু এক শ্রেণীর লোকের জন্যও কথিত হয় নাই, ইহা সার্ব্বজনীন; সকল লোকের সকল কালের উপযোগী যে শাশ্বত অধ্যাত্ম ধর্ম্ম, গীতায় প্রধানতঃ তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। প্রচলিত কোন প্রকার সাধনাকেই গীতা অগ্রাহ্য করে নাই, বলিয়াছে সকল প্রকার সাধনা দ্বারাই আত্মোন্নতি সাধন করা যায়—

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ। ৪।৩০

তথাপি গীতার একটি নিজস্ব সাধনা আছে, সকল সাধনার সার সমন্বয় করিয়া গীতা এক বিশেষ সাধনপন্থার নির্দ্দেশ দিয়াছে, এবং অর্জ্জুনকে এক প্রতিনিধি-মানব রূপে গ্রহণ করিয়া সকল মানবের জন্যই সেই পন্থার ব্যাখ্যা করিয়াছে। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অগ্রসর; কিন্তু সাধারণ ভাবে এই সংসারই এক বিরাট কুরুক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র—এখানে বিনা যুদ্ধে কেহ এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না, যে-সব আসুরিক শক্তি এখন জগৎকে, মানব-জীবনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহারা বিনা যুদ্ধে মানুষকে সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। গীতা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সকল মানবকেই এই মহান জীবন-যুদ্ধে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইতে বলিয়াছে, এবং আসুরিক শক্তি-সকলকে জয় করিয়া এই পৃথিবীতেই ধর্ম্মরাজ্যের, স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়াছে—ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্। কাম ক্রোধই হইতেছে মানুষের শ্রেয়ঃ লাভের প্রধান বিঘ্ন, ইহারা মানুষের শত্রু, ইহারা আমাদের মধ্যে যে ছিদ্র করিয়া দেয় সেই পথেই জগতের আসুরিক ও পৈশাচিক শক্তি সকল আমাদের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ আমাদিগকে অধিকার করিয়া লয়, আমাদিগকে যন্ত্র করিয়া জগতে তাহাদের আসুরিক ও পৈশাচিক লীলার বিস্তার করে, সেইজন্য গীতা প্রথমেই কাম ও ক্রোধকে জয় করিতে বলিয়াছে,

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্। ৩।৪৩

অথচ মানবজীবনের একটা স্তরে কাম ও ক্রোধের স্থান আছে, উপযোগিতা আছে। যে-সকল মানব নিম্নতম স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, প্রকৃতির অধমগুণ তমোগুণের অধীন রহিয়াছে—তাহারা কাম ক্রোধের দ্বারা চালিত না হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, জীবনে প্রবৃত্ত হয় না; এ-অবস্থা মানবাত্মার পক্ষে মৃত্যু স্বরূপ, ইহা মানুষকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন সহসা এই অবস্থাতে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতায় ভগবান সকল তমোগ্রস্ত মানবকেই বলিয়াছেন,

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।

অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া গীতা মানুষকে জীবনযুদ্ধে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইতেই উপদেশ দিয়াছে, এবং এইটিকেই প্রবৃত্তিমার্গ বলা যাইতে পারে। আর যাহারা রজোগুণের বশে কামক্রোধের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, অর্জ্জুনের রাজসিক ক্ষত্রিয়

প্রকৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতা তাহাদিগকেই বলিয়াছে, কর্ম্মেই তোমাদের অধিকার কিন্তু ফলে নহে—কর্ম্ম করিবে কিন্তু ফলকামনায় কর্ম্ম করিও না, কাম-ক্রোধেব বেগকে সহ্য করিতে অভ্যাস কর। তাহা হইলে আমরা কি অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিব? কোন কিছু কামনা করিয়াই ত মানুস কর্ম্ম করে, কামনা না থাকিলে কিসেব জন্য কোন্ কর্ম্ম করিব? এই প্রশ্নের উত্তরেই গীতা বলিয়াছে, শাস্ত্র অনুসরণ কবিয়া কর্ম্ম কর; কামের বশে কর্ম্ম না করিয়া কোন উচ্চ নীতি, উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম কর, নতুবা উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারিবে না, প্রকৃত সুখও মিলিবে না,

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ১৬।২৩

কিন্তু এইটিও গীতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা নহে, মানুষের উচ্চতম আধ্যাত্মিক অবস্থা বা পদ নহে। সে পদ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে শাস্ত্রবিধিকে, সকল প্রকার মানসিক বিধিনিষেধকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে, মন বুদ্ধিব উর্দ্ধে যে আত্মা রহিয়াছে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, অধ্যাত্ম-চৈতন্য হইতে সকল কর্ম্ম করিতে হইবে। সেইজন্যই গীতা কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিতে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছে। কাম ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়া, অধ্যাত্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাক্ষাৎভাবে ভগবৎপ্রেরণায় সকল কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠ পরিণতি—গীতা এইটিকেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছে এবং অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সাধনারই বিভিন্ন স্তর বর্ণনা কবিয়াছে। প্রথম স্তর হইতেছে তামসিকতা ও ক্লৈব্য বর্জ্জন কবিয়া বীরের মত জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া; দ্বিতীয় স্তর হইতেছে কাম-ক্রোধের বেগকে জয় করা। এই দ্বিতীয় স্তরটিকেই নিবৃত্তিমার্গ বলা যায়; ইহার সহিত প্রবৃত্তিমার্গের যে বিরোধ কল্পনা করা হয়, গীতা তাহা স্বীকার করে নাই, গীতার মতে ইহা সাধনার পর পর দুইটি স্তর বা অবস্থা। নিবৃত্তিমার্গে উঠিলেই প্রবৃত্তির শেষ হইয়া যায় না, তবে সে প্রবৃত্তি কাম ও ক্রোধ হইতে না আসিয়া ক্রমশঃ উচ্চ ও উচ্চতর স্তর হইতে, এবং শেষ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎভাবে ভগবান হইতে আইসে; তখনই হয় দিব্য কর্ম্ম, দিব্য জীবন। ভগবান হইতে, আত্মা হইতে এই যে প্রবৃত্তি আইসে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,

ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ। ৭।১১

জীবের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম তাহা বর্জ্জনীয় নহে। গীতায় যে কাম

বর্জ্জনের কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে রজোগুণ হইতে উৎপন্ন নিকৃষ্ট কাম, কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কাম-ক্রোধই মানুষকে পাপে প্রবৃত্ত করায়; ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম তাহা আমাদের মধ্যে ভগবানেরই ভোগেচ্ছার প্রকাশ, তাহার অনুসরণে পাপ হইতে পারে না।

ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম বলিতে অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী যদি কামোপভোগ করে তাহাতে কোন পাপ হয় না। কিন্তু ইহা বস্তুতঃ গীতার শিক্ষা নহে, স্বামী-স্ত্রীও যদি কামের উত্তেজনায় যৌন সংসর্গ করে তাহা হইলে তাহাদেব পাপই করা হয়, তাহাদের ঊর্দ্ধগতি ব্যাহত হয়। রামকৃষ্ণ বিবাহিত জীবনে স্ত্রীসংসর্গের দোষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "দুটো ফুল ফেলে দিলেই কি শুদ্ধ হয়ে যায়?" অর্থাৎ, মন্ত্রপাঠ করিয়া বিবাহ করিলেই যে স্ত্রী-পুরুষ সকল পাপের দায় হইতে মুক্ত হয় তাহা নহে। কামের বশে যখনই চলা যায় তখনই হয় পাপ, এইজন্যই আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর গার্হস্থ্য আশ্রমের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য পশুরা যেমন কামের বশে যৌনসংসর্গ করে নর-নারী যেন সেইভাবে মিলিত না হয়, কারণ তাহাতে তাহাদের ঊর্দ্ধতর অধ্যাত্ম জীবনবিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়, এবং সেই অধ্যাত্ম-জীবন লাভই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, নিঃশ্রেয়স্। 'প্রকৃতিই মানুষের মধ্যে কাম দিয়াছে, মানুষ প্রকৃতির অনুসরণ করিবে তাহাতে দোষ কি? জোর করিয়া কি প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেহ যাইতে পারে? প্রকৃতিকে এইভাবে নিগ্রহ করিলে তাহার ফল কখনই ভাল হয় না।'—আজকাল অনেকেই এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া কামকে প্রশ্রয় দেন, ইহা মানবজীবনের, মানবসমাজের পক্ষে অতিশয় অনর্থকর। মানুষ পশুর স্তর হইতে ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা মানবত্বের মধ্যে উঠিয়াছে, এখনও তাহার মধ্যে পশুসুলভ অনেক কিছুই রহিয়াছে, কাম ও ক্রোধ তাহাদেরই অন্তর্গত। মানুষের প্রকৃতিতে ঊর্দ্ধতর সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়াছে। রজোগুণ যেমন মানুষের প্রকৃতির অন্তর্গত, তাহার দ্বারা মানুষের মধ্যে কাম ও ক্রোধের উদ্রেক হয়, তেমনই মানুষের প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণও রহিয়াছে, তাহার দ্বারা মানুষ কাম ও ক্রোধকে সংযত করিয়া ঊর্দ্ধতর জীবনের বিকাশ করিতে চায়—অতএব ইন্দ্রিয়সংযম, কামজয় এ-সব মানব-প্রকৃতিতেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়সংযম করিলে বস্তুতঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া হয় না, পরন্তু প্রকৃতির ঊর্দ্ধতর প্রবৃত্তির দ্বারা তাহার নিম্নতন পাশবিক

প্রবৃত্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়, এবং এইভাবেই মানুষ ক্রমশঃ অধ্যাত্ম-জীবনের দিকে অগ্রসর হয়।

এইটিই ভারতের সনাতন আদর্শ—সংসারের ভোগসুখ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করা নহে ; আবার ঐ সবকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করাও নহে। যাহারা কামোপভোগকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে, কামোপভোগপরমাঃ, গীতা তাহাদিগকে আসুরিক-প্রকৃতিসম্পন্ন মানব বলিয়াছে, তাহারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝে না (১৬।৭)। প্রবৃত্তিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, পশুর মত কাম উপভোগ না করিয়া এমনভাবে তাহা করিতে হইবে যেন তাহা আমাদিগকে মানবজীবনের যাহা পরম লক্ষ্য মোক্ষ বা অধ্যাত্মজীবন সেই দিকে লইয়া যায়। অর্থ ও কামকে বর্জ্জন করিতে হইবে না, কিন্তু তাহাদিগকে ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহাদের ভিতর দিয়াই মানুষের প্রকৃতির সুবিকাশ হইবে, মানুষ দিব্যজীবনের দিকে অগ্রসর হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—ইহাই চতুর্ব্বর্গ। বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষার ফলে ভারতবাসী অর্থ ও কামকে বর্জ্জন করিয়া সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকিতেছিল, ঐরূপ নিবৃত্তিকেই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছিল, এইভাবে বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সামঞ্জস্য নষ্ট হইতেছিল, সেই সময়ে গীতা পুনরায় সেই বৈদিক আদর্শের মূল সত্যটি প্রচার করিয়াছে। সংসারকে ত্যাগ করা নহে, সংসারে থাকিয়া সংসারের ভোগসুখ এমনভাবে গ্রহণ করা যেন এই সংসারেই মানুষ দিব্যজীবন লাভ করিতে পারে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

বাল্মীকি রামচরিত্রে ভারতের এই আদর্শটি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন,

ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
লৌকিকে সময়াচারে কৃতকল্পো বিশারদঃ॥

—রামায়ণ, অযোধ্যা ১।২২

"রামচন্দ্র ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ ভাবে অবগত ছিলেন, তিনি সমুচ্চ প্রতিভা ও স্মৃতিসম্পন্ন ছিলেন, লোকাচার ও দেশাচারে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং সে-সব সম্যক্‌ভাবে অনুসরণ করিতেন।" তিনি বেদ, বেদাঙ্গ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রভৃতি গভীরভাবেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম

ও অর্থের দাবী পূরণ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক কর্ত্তব্যসকল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া তবে তিনি ভোগসুখ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতেন, তিনি কখনও অলস থাকিতেন না—

অর্থধর্ম্মৌ চ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো ন চালসঃ।

—রামায়ণ, অযোধ্যা ১।২৭

জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার জন্য যে-সব শিক্ষা প্রয়োজন রামচন্দ্র সে-সবেই সুশিক্ষিত ও বিশারদ ছিলেন,

বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থবিভাগবিৎ।
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণবাজিনাম্ ॥

—রামায়ণ, অযোধ্যা ১।২৮

"তিনি সুকুমার শিল্পসকলে পারদর্শী ছিলেন, কেমন করিয়া অর্থ বিভাগ ও ব্যয় করিতে হয় তাহা ভাল রকমেই জানিতেন, তিনি অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন এবং হস্তী ও অশ্বকে শিক্ষিত কবিতে জানিতেন।"

রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

কশ্চিদর্থং চ কামং চ ধর্ম্মং চ জয়তাংবর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্ব্বান্ বরদ সেবসে ॥

—রামায়ণ, অযোধ্যা ১০০।৬৩

"হে বিজয়ীশ্রেষ্ঠ! তুমি কি সুবিচারপূর্ব্বক তোমার সময় ধর্ম্মাচবণ, রাজ্য-শাসন কার্য্য এবং কামোপভোগের জন্য বিভাগ কর ?"

অতএব সন্ন্যাসীরা যে কামিনী ও কাঞ্চন একেবারে বর্জ্জন করিবার উপদেশ দেন, ইহা ভারতের সনাতন আদর্শ নহে, তাহাদের সুব্যবহারের দ্বারাই মানুষ ক্রমশঃ মোক্ষ বা দিব্যজীবনের জন্য প্রস্তুত হয়—এই আদর্শই বেদে প্রচারিত হইয়াছিল। কালক্রমে সেই আদর্শ মলিন হইয়া পড়ায় ভারতবাসী যখন সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করে, সন্ন্যাসকেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া প্রচার করে, তখন গীতা আবার সেই বৈদিক আদর্শের প্রচার করিয়াছে।

গীতা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ত্যাগ করিতে বলে নাই, পরন্তু যে-ভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ গ্রহণ করিলে তাহা দুঃখ ও বন্ধনের কারণ হয় তাহাই সমূলে বর্জ্জন

করিতে বলিয়াছে। কাম ও ক্রোধের বেগই হইতেছে এই দুঃখ ও বন্ধনের মূল, অতএব তাহা দূর করিতেই হইবে। কাম ও ক্রোধ আমাদের মন প্রাণ ও স্নায়ুমণ্ডলে যে তীব্র বিক্ষোভ উৎপন্ন করে তাহা বেদনাদায়ক, ঐ অশান্ত অবস্থায় কেহই প্রকৃত সুখ বা আনন্দ লাভ করিতে পারে না, অশান্তস্য কুতঃ সুখম্। পশুর ন্যায় কামোপভোগ করিয়া মানুষ যে সুখ পায় তাহা অতিশয় ক্ষণিক এবং তাহা বেদনার সহিত মিশ্রিত এবং অবিলম্বে তাহা যে প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে, তাহাতে দেহ, প্রাণ, মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। অজ্ঞান মানুষ এইটিকেই পরম সুখ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে, তাই সে সর্ব্বদা এই বিষাক্ত পাত্র মুখে তুলিয়া লইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় এবং পুনঃ পুনঃ সেই বিষ পান করিয়া অশেষ দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করে। এই জন্যই গীতা সর্ব্বপ্রথমে কাম ও ক্রোধকে প্রকৃতি হইতে নির্ম্মূল করিতে বলিয়াছে। আসক্তি হইতে, রাগ ও দ্বেষ হইতেই কাম ও ক্রোধের বেগ উৎপন্ন হয়—আসক্তি বর্জ্জন করিলেই কাম ক্রোধ আর আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, তখন রাগ-দ্বেষ-শূন্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয় ভোগ গ্রহণ করিয়া আমরা শান্তি ও প্রকৃত আনন্দ লাভ করি (২।৬৪)।

কিন্তু প্রকৃতির বশেই কাম-ক্রোধের বেগ উৎপন্ন হয়, কাম-ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে তাহার কার্য্য হইবে না ইহা কি সম্ভব? মানুষ কি প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাইতে পারে? মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। মানুষের মধ্যে কাম-ক্রোধের বেগ আদৌ অবশ্যম্ভাবী নহে এবং উহা প্রকৃতির মূলগত কোন সত্য নহে। অভ্যাসের বশেই মানুষ কাম-ক্রোধের অধীন হয়, সাধনা ও প্রযত্নের দ্বারা মানুষ এই অভ্যাস নিশ্চয়ই দূর করিতে পারে, বহু মানবই তাহা করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকেই সাধু ও সচ্চরিত্র বলা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন সুন্দরী যুবতী রমণী সম্মুখে আসিলে পুরুষের মধ্যে যে কামের বেগ উৎপন্ন হয়, সেটা কেবল অভ্যাসের দোষ, পূর্ব্ব সংস্কারের ক্রিয়া। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যৌন সম্বন্ধটাকেই মানুষ বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে, তাই স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের সম্মুখে আসিলে ঐ যৌন ক্ষুধাটাই জাগ্রত হইয়া উঠে। সমাজ যে স্ত্রী-পুরুষকে পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতে নিষেধ করে তাহাতে ঐ অভ্যাস ও সংস্কার আরও বদ্ধমূল হইয়া যায়, কোনরকমে স্ত্রীপুরুষ একত্র হইলে যৌনচিন্তা দূর

করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। রীতিমত সৎ শিক্ষা ও সৎ অভ্যাসের দ্বারা এই বিকৃতি সম্পূর্ণভাবেই দূর করা যায়।

স্ত্রীলোকের সম্মুখে আসিলেই যে কামভাব উৎপন্ন হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত মা ও বোনের সহিত পুত্র ও ভ্রাতার সম্বন্ধ। সুন্দরী স্ত্রীলোকের চিত্র দেখিলে কামভাবের উদয় হয়, কিন্তু পূর্ণযৌবনা অপরূপ সৌন্দর্য্যময়ী লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভগবতীর চিত্র দেখিয়া, এমন কি সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী শ্যামামূর্ত্তি দেখিয়াও বিন্দুমাত্র কামভাবের উদয় হয় না—কারণ ঐ সময়ে আমরা যৌন চিন্তা করি না, যৌনলালসাকে প্রশ্রয় দিই না। মাতা ও ভগ্নীর সম্মুখে, দেবী মূর্ত্তির সম্মুখে যে পবিত্র ভাব রক্ষা করা সম্ভব, সকল স্ত্রীলোকের সম্মুখেই সেই ভাব রক্ষা করা যায়, সেই অভ্যাসই প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংযমের উপায়। প্রকৃতিতে কামভাবের উদয় হইলে কখনই তাহাকে প্রশ্রয় দিতে নাই, তদনুসারে কোন কাজ করিতে নাই, যৌন চিন্তা মনে স্থান দিতে নাই--তাহা হইলে আমাদের প্রকৃতি হইতে ঐ সব কু-অভ্যাস ও কু-সংস্কার দূর হইয়া যাইবে, কারণ পুরুষ পুনঃ পুনঃ যে সঙ্কল্প করে, প্রকৃতি নিশ্চয়ই তদনুসারে নিজেকে পরিবর্ত্তিত করে, ইহাই শাশ্বত বিধান।

কাম ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশ করিতে হইবে, মানুষ বহুদিনের অভিজ্ঞতায় ইহা উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা যে-ভাবে অভ্যাস করা হয় তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না, অনেক সময় বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে এবং সেই বিপরীত ফলকে লক্ষ্য করিয়াই আজকাল কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাসকে অনিষ্টকর বলিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়সংযমে দেহ, প্রাণ, মনের কোনই ক্ষতি হয় না, বরং কাম ও ক্রোধের উত্তেজনায় শরীরের যে ক্ষয় হয় তাহাই মানুষকে জরা ও ব্যাধি এবং শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুর কবলে লইয়া যায়। চিকিৎসাতত্ত্ববিশারদ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন,

মৃত্যুব্যাধিজরানাশি পীযূষং পরমৌষধম্।
ব্রহ্মচর্য্যং মহদ্বলং সত্যমেব বদাম্যহম্॥

"ব্রহ্মচর্য্য জরা ব্যাধি ও মৃত্যু বিনাশক অমৃতময় পরম ঔষধ, ইহা মহান্ বল স্বরূপ, এ কথা আমি সত্যই বলিতেছি।"

শান্তিং কান্তিং স্মৃতিং জ্ঞানমারোগ্যং যাপি সন্ততিম্।
যদিচ্ছন্তি মহদ্ধর্মং ব্রহ্মচর্য্যং চরেদিহ॥

"যে ব্যক্তি শান্তি, কান্তি, স্মৃতি, জ্ঞান, আরোগ্য কামনা করেন এবং সুস্থ ও মেধাবী সন্তান কামনা করেন তিনি ব্রহ্মচর্য্যরূপ মহান ধর্ম্ম পালন করুন।"

কাম ও ক্রোধের উত্তেজনায় স্নায়ুমণ্ডলে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, রেতঃ ক্ষয় হয়, সংযম অভ্যাস করিলে ঐ রেতঃ শরীরের মধ্যে থাকিয়া ওজঃ শক্তিতে পরিণত হয়, তাহার দ্বারা শরীর, প্রাণ, মনের দিব্যশক্তির বিকাশ সম্ভব হয়, মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য হইয়া উঠে। মানুষ যেদিন কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে প্রকৃতি হইতে নির্ম্মূল করিতে পারিবে সেইদিন সে এই পৃথিবীতে মৃত্যুকেও জয় করিতে পারিবে, এই দেহেই পরম ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে—

যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি···অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪।৪।৬,৭,

কাম ও ক্রোধকে নির্ম্মূল করিবার প্রকৃত উপায় কি? মানুষ কাম ক্রোধের বশে চালিত হইয়া কর্ম্ম করিলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না, সেইজন্য সমাজ শাস্তির বিধান করিয়াছে, শাস্তির ভয়ে লোকে কাম ক্রোধকে সম্বরণ করে। কিন্তু এই ভাবে প্রকৃতির শুদ্ধি সাধন হয় না। সমাজে একটা বাহ্যিক শৃঙ্খলা হয়, তাহার মধ্যে মানুষ সভ্য ও শান্তিময় জীবন যাপন করিয়া আত্মোন্নতি করিবার সুযোগ পায়, এইজন্য এইরূপ সামাজিক ব্যবহারের সার্থকতা আছে। কিন্তু শুধু ইহার দ্বারাই প্রকৃত রোগের প্রতিকার হয় না, মানুষ সমাজকে নানাভাবে ফাঁকি দিয়া কাম-ক্রোধের তৃপ্তি করে—ফলে ব্যক্তির জীবন বা সমাজের জীবন উন্নতির পথে আর অগ্রসর হইতে পারে না, পুনঃ পুনঃ একটা গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরিতে থাকে। তাই যুগযুগান্ত ধরিয়া সমাজ-শাসন সত্ত্বেও মানুষ মূলতঃ যেরূপ কাম-ক্রোধের অধীন ছিল তেমনিই আছে, ক্বচিৎ কখনও দুই এক জন ব্যক্তিগত বিশিষ্ট সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছে। ধর্ম্মের শাসন সমাজের শাসনকে সমর্থন করিয়াছে, সমাজকে ফাঁকি দিলেও ধর্ম্মকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, পাপ করিলে ইহজন্মে না হউক মৃত্যুর পর নরকে গিয়া কিম্বা পরজন্মে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে। এইভাবে সমাজে একটা বাহ্যিক নৈতিকতা ও ধার্ম্মিকতার আবেষ্টন সৃষ্ট হইলেও, ভিতরকার মানুষটি যেমনকার তেমনই থাকিয়া গিয়াছে, তাহার প্রকৃতির মূলগত কোন পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরই হয় নাই। ইহা

হইতেই আবার অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, মানুষ যেমন চিরকাল কাম ও ক্রোধের অধীন ছিল, ভবিষ্যতেও তেমনই থাকিবে, মানব-প্রকৃতির, মানব-চরিত্রের কোন রূপান্তর সম্ভব নহে। মানুষকে যদি মুক্তি ও অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে এই দেহ, প্রাণ, মনের প্রাকৃত জীবন ছাড়িয়া যাইতেই হইবে।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা আদৌ গীতার শিক্ষা নহে ; এই দেহে, এই জীবনেই (প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই—বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫) মানুষকে মুক্ত হইতে হইবে, দিব্য জীবন লাভ করিতে হইবে। তবে সেজন্য লৌকিক, সামাজিক,ধার্ম্মিক বিধিনিষেধ পালনই যথেষ্ট নহে,সেজন্য যোগসাধনার প্রয়োজন। ধর্ম্মজীবন, নৈতিক জীবন—কোনটিই অধ্যাত্ম-জীবন নহে, এ সবের দ্বারা মানুষ অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য কতকটা প্রস্তুত হইতে পারে। পরন্তু যোগসাধনা ভিন্ন অধ্যাত্ম-জীবন লাভ সম্ভব নহে, গীতা তাহারই শিক্ষা দিয়াছে। ইহকালে বা পরকালে দুঃখের ভয়, শাস্তির ভয়, নরকের ভয় দেখাইয়া মানুষকে যে বাহ্যিক ব্যবহারে সংযত করা যায় তাহাতে সমাজের সাময়িক সুবিধা হইতে পারে বটে কিন্তু মানুষের প্রকৃতির যে আমূল পবিবর্ত্তন অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য প্রয়োজন তাহা সম্ভব হয় না। অন্য পক্ষে, বিধিনিষেধের অতিমাত্রতা ও নিগ্রহের ফলে দেহ, প্রাণ, মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহাতে আত্মার বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়, আত্মানম্ অবসাদয়েৎ। পাপের ভয় দেখাইয়া সমাজে বাহ্যিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য হইতে পারে, কিন্তু ঐ ভয়ই আবার আত্মোন্নতির পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। যেমন কাম ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, তেমনই ভয়কেও বর্জ্জন করিতে হইবে, বীতরাগভয়ক্রোধঃ, কারণ এই তিনটিই হইতেছে আত্মোন্নতির অন্তরায়।

পাপের ভয়ে মানুষ কিরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যুদ্ধে জ্ঞাতিহত্যা, গুরুহত্যা করিলে যে পাপ হইবে তাহার ভয়েই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে বিমুখ হইয়াছিলেন। পাপ পুণ্যের প্রভেদ আছে, সে প্রভেদ অগ্রাহ্য করিলে মানুষের কল্যাণ নাই। যে-সব মানুষ কাম ক্রোধের অধীন থাকিয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে, পাপের ভয়েই তাহারা নিজদিগকে কতকটা সংযত করে এবং এই ভাবেই ঊর্দ্ধতর জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই পাপের ভয় প্রকৃতিতে বদ্ধমূল হইয়া

গেলে তাহাই আবার ভীষণ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তাই গীতা বলিয়াছে, যোগী পাপপুণ্য উভয়কেই বর্জ্জন করেন, বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।

পাপের যে ভয়, সেটা অজ্ঞানপ্রসূত। বস্তুতঃ পাপ-পুণ্য কি, তাহাদের ফলাফল কি সে-সম্বন্ধে যখন আমাদের প্রকৃত জ্ঞান হয় তখন আর আমরা বৃথা ভয় পাই না, সজ্ঞানে পাপকে বর্জ্জন করি, পুণ্যময় পথেই অগ্রসর হই। পাপ করিলে তাহার দুঃখময় ফল আছে ইহা নিশ্চিত, কিন্তু পাপের ফলে নরকে গিয়া পচিতে হইবে এটা কল্পিত কাহিনী ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৃথিবীর নিম্নে নরক বলিয়া এক ভীষণ স্থান আছে, সেখানে পাপীগণকে অশেষ যন্ত্রণা দেওয়া হয়—এ-সব সম্পূর্ণ অজ্ঞানের কথা। লোকে নরকের কথা বিশ্বাস করে বলিয়া গীতাও নরকের উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু গীতার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, নরক কেবল একটি রূপক মাত্র, উহা আত্মার অবনতি বা অধোগতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতিতে ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে জড় হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে জন্তু, জন্তু হইতে মানবের উদ্ভব হইয়াছে—মানুষ যে-সব নূতন শক্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের কল্যাণে সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াছে। ঐ ক্রমবিবর্ত্তনের ধারাতেই তাহাকে আরও উচ্চস্তরে উঠিতে হইবে, দিব্য মানব বা অতিমানব হইতে হইবে। যেরূপ আচরণের দ্বারা মানুষের এই ঊর্দ্ধগতিতে সাহায্য হয় তাহাই পুণ্য, আর যেরূপ আচরণের দ্বারা সে পাশবিকতার মধ্যেই বদ্ধ থাকে অথবা তাহার মধ্যে রাক্ষস বা অসুর ভাবের বিকাশ হয় তাহাই পাপ। কাম ক্রোধ মানুষকে পাশবিক ও আসুরিক ভাবের দিকেই লইয়া যায়, তাই ইহারা পাপ, মানুষকে যে দেবত্বের পথে অগ্রসর হইতে হইবে এইগুলি হইতেছে তাহাতে প্রতিবন্ধক, তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ। সমাজের শাসনের ভয়ে নহে, নরকের ভয়ে নহে, পরন্তু জ্ঞানের সহিত ঊর্দ্ধতর দিব্য জীবন লাভের কামনা লইয়া যদি আমরা দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত কাম-ক্রোধকে জয় করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলেই আমরা কৃতকার্য্য হইবার আশা করিতে পারি। কাম ক্রোধকে জয় করিবার জন্য অনেকেই শরীরকে নানাভাবে নিগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফলই হয় না, বরং উল্টা বিপত্তিই হইতে পারে। অনেক সময়ে এইরূপ নিগ্রহের ফলে বাধা পাইয়া কাম ক্রোধের বেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তখন তাহাকে আর সামলান যায় না। কামকে জয় করিবার জন্য অনেকেই পরামর্শ দেন,

স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসিও না, তাহাদের মুখদর্শন এমন কি তাহাদের চিত্র পর্য্যন্ত দর্শন করিও না। কিন্তু এই ভাবে কামের হাত এড়ান যায় না। যতক্ষণ ইহার বীজ আমাদের প্রকৃতিতে নিহিত থাকিবে ততক্ষণ ইহার উত্তেজক নিমিত্তের অভাব কখনই হইবে না। কথিত আছে প্রাচীনকালে একজন ঋষি মৎস্যের রমণ ক্রিয়া দেখিয়া কামাতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন। লতাবৃক্ষের মধ্যেও অহরহঃ যৌন ক্রিয়া চলিতেছে; যে পুষ্পকে আমরা এত পবিত্র বলিয়া দেবতার চরণে অর্পণ করি তাহা হইতেছে লতাবৃক্ষের জননেন্দ্রিয়। চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া গুহার মধ্যে বাস করিলেও আমাদের অবচেতনা হইতে কামের বেগ উত্থিত হইবে। অতএব ইন্দ্রিয়পথ রুদ্ধ করিয়া কামের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই—আমাদের ভিতরটাকে শুদ্ধ করিতে হইবে এবং ইহা কেবল আভ্যন্তরীণ সাধনাব দ্বারা হইতে পারে, এবং তাহাই যোগসাধনা।

প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে অনেক প্রকার যোগসাধনা প্রচলিত আছে—হঠযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, তান্ত্রিকযোগ। সাধক আপন প্রকৃতি অনুযায়ী, সামর্থ্য অনুযায়ী যে-কোন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, গীতা সকল প্রকার যোগসাধনারই ইঙ্গিত দিয়াছে—তবে গীতার যে নিজস্ব যোগ তাহা হইতেছে একটা সমন্বয়। আর আধুনিক যুগের মানুষের পক্ষে এইরূপ একটা সমন্বয়ই উপযোগী। জীবনের অধিকাংশ সময় হঠযোগ ও রাজযোগের আসন ও প্রাণায়াম অভ্যাস করা এখন খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। আমাদের এই দেহ, প্রাণ, মন যে গতানুগতিক ভাবে চলিতে বাধ্য নহে, যত্ন করিলে যে ইহাদের মধ্যে অসাধারণ শক্তিসকলের বিকাশ করা যাইতে পারে, প্রাচীন যোগপ্রণালী-সকল তাহা প্রত্যক্ষ ভাবেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। তবে তখন যাহা কতকগুলি বিশেষ সাধকের পক্ষেই সম্ভব ছিল, এখন প্রকৃতির ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে তাহা মানব-সাধারণের পক্ষেই সহজ ও সুলভ হইতে চলিয়াছে। গীতা এইরূপই একটি সহজ ও সুলভ পথ দেখাইয়া দিয়াছে, সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্।

মানুষ যতক্ষণ প্রকৃতির খেলায় নিমগ্ন রহিয়াছে, প্রকৃতির মধ্যে যে ত্রিগুণের খেলা যন্ত্রবৎ চলিতেছে তাহার সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছে ততক্ষণ সে কাম ক্রোধের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কাম ক্রোধ রজোগুণের

ক্রিয়া। প্রথমতঃ সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া পরে সকল গুণের অতীত হইয়া, আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মানুষ প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে পারে। তাহার পূর্ব্বে যে-সিদ্ধি তাহা কেবল সাময়িক ও অসম্পূর্ণ। আমরা যাহাতে অন্তরস্থিত আত্মা সম্বন্ধে জাগ্রত হই, প্রকৃতির সমস্ত খেলা হইতে নিজদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি, সেই জন্য গীতা আত্মা ও অন্তঃপুরুষের সন্ধান দিয়াছে এবং তাহাতেই মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছে, তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ (৫।১৭), ইহাই জ্ঞানযোগ। আবার কর্ম্মের দ্বারাও চিত্ত শুদ্ধি হয়, প্রকৃতির রূপান্তব হয়, সেই জন্য যোগিগণ কায় মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সকলের দ্বাবা কর্ম্ম করেন (৫।১১)। ইহাই কর্ম্মযোগ। আবার ভগবানকে সমস্ত হৃদয় মন দিয়া ভালবাসিতে পারিলে, অতি দুরাচার ব্যক্তিও শীঘ্র সাধু হইয়া উঠে (৯।৩০)। ইহাই ভক্তিযোগ। গীতা এই সকল যোগেরই উপদেশ দিয়াছে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে হঠযোগ ও রাজযোগেরও উপদেশ দিয়াছে। সকল প্রকার যোগ-প্রণালী হইতেই সাধক নিজ সামর্থ্য ও প্রযোজন ও প্রকৃতির গতি অনুযায়ী কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিতে পাবে। কিন্তু সকল প্রণালীতেই মূলতঃ তিনটি জিনিষ রহিয়াছে। প্রথমেই চাই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা— মানুষ বর্ত্তমানে যে দুঃখদ্বন্দ্বময় জীবন যাপন কবিতেছে ইহাই যে তাহার চরম সম্ভাবনা নহে, ইহা অপেক্ষা এক উর্দ্ধতর জীবন আছে, সেইটি লাভ করাই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, নিঃশ্রেয়স্, এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া সকল সময়ে সেই উর্দ্ধতর জীবনের জন্য অভীপ্সা জাগাইযা রাখা; তাহাই মন ও বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিবে, প্রাণের মধ্যে অধ্যাত্ম-অগ্নি জ্বালাইয়া দিবে। মানুষ যেরূপ কামনা করে সেইরূপই হইয়া উঠে, "কামময় এবায়ং পুরুষঃ"—এই পুরুষ কামনাময়, যিনি যেমন কামনা করেন, তিনি তেমনই গতি লাভ করেন। আমরা যদি সর্ব্বদা পাশবিক ভাবে ইন্দ্রিয়ভোগের কামনা করি, আমাদিগকে জন্ম মৃত্যু দুঃখের অধীন এই জীবনের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে; আর যদি আমরা বলিতে পারি যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহম্ তেন কুর্য্যাম্, তাহা হইলে আমরা ইহজগতেই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি, অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন, প্রকৃতির সমস্ত অশুদ্ধ ক্রিয়াকে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত বর্জ্জন করা। যখন কাম-ক্রোধের বেগ উপস্থিত হইবে, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির

সহায়ে তাহাকে নিবারণ করিতে হইবে, তাহার বশে কোন কর্ম্ম করা চলিবে না। যতবার এইরূপ বেগ উত্থিত হইবে, ততবারই তাহা নিবারণ করা অভ্যাস করিতে হইবে, প্রকৃতির মধ্যে কোথায় কি অশুদ্ধ ক্রিয়া চলিতেছে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিতে হইবে এবং বর্জ্জন করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ প্রয়োজন ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণ। সর্ব্বদা ভাগবত জ্যোতি, শক্তি ও আনন্দকে উর্দ্ধ হইতে আহ্বান করিতে হইবে, তাহা যেন আমাদের দেহ, প্রাণ, মনে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সমগ্র আধারকে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করিয়া দেয়।

এই তিনটি—উর্দ্ধতম অধ্যাত্মজীবন লাভের অভীপ্সা, যাহা কিছু তাহার প্রতিবন্ধক পুনঃ পুনঃ সে-সব বর্জ্জন এবং ভগবানের নিকট ঐকান্তিক ভাবে আত্মসমর্পণ—এই তিনটিই হইতেছে যোগসাধনার মূল তত্ত্ব; আর যাহা কিছু তাহা হইতেছে বহিরঙ্গ ও গৌণ, আপন আপন প্রয়োজন বা অভিরুচি মত সাধক সে-সবের সাহায্য গ্রহণ করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। আর এই যে আভ্যন্তরীণ যোগসাধনা, ইহার জন্য বনে বা পর্ব্বতগুহায় যাইবার প্রয়োজন হয় না, সংসারে সকল কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াই মানুষ এই যোগ অভ্যাস করিতে পারে। তবে এই সাধনার অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা না থাকিলে সাধনায় অগ্রসর হওয়া কঠিন এবং অজ্ঞান মানুষ শুধু নিজে নিজেই এই সাধনার পথে চলিতে পারে না—এই জন্যই ভারতে প্রাচীন কাল হইতে গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর সাহায্যে অধ্যাত্ম সাধনার ব্যবস্থা আছে। গুরুই আমাদের শ্রদ্ধা ও অভীপ্সাকে দৃঢ় করিয়া দেন, কাম ক্রোধাদি রিপুর বেগকে সংযত করিতে উৎসাহ ও শক্তি দেন, গুরুকে ভগবানের প্রতিনিধি জানিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াই আমরা ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ সিদ্ধ করিয়া তুলি। গীতা এই সকল সাধনার বিষয় বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করে নাই। সাধনার মূল তত্ত্বগুলিরই ইঙ্গিত দিয়াছে।

স যুক্তঃ স সুখী নরঃ—দৃঢ়নিষ্ঠ সাধনার দ্বারা যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বেগকে সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই যোগী, সেই প্রকৃত সুখী। কিন্তু এইরূপ লোকের পক্ষে কি আর সাংসারিক জীবন যাপন করা সম্ভব? সাংসারিক জীবন যাপন করিতে হইলে দুইটি জিনিষ অপরিহার্য্য—আত্মরক্ষা ও বংশ রক্ষা। এই দুইটির জন্যই কি কাম ও

'ক্রোধের বেগ আবশ্যক নহে? গীতা যে বলিয়াছে, এই দেহেই কাম ও ক্রোধের বেগকে সম্বরণ করিতে হইবে, তাহার অর্থ কি ইহাই নহে যে, শেষ পর্য্যন্ত ইহ-জীবনেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে? শঙ্করাদি সন্ন্যাসিগণ গীতার এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা গীতার শিক্ষা নহে। গীতা বলিয়াছে, সন্ন্যাসও নিঃশ্রেয়স্ লাভের একটা পথ বটে, কিন্তু ঐটিই একমাত্র পথ নহে, উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ হইতেছে কর্ম্মযোগ। গীতা কাম ক্রোধের বেগ হইতে মুক্ত হইয়াই কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে, এবং তাহাই কর্ম্মযোগের পরিপক্ক অবস্থা। গীতার গুরু অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু কাম ক্রোধের বশে নহে, যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ; কাম ক্রোধাদি হইতে প্রাণ মন শরীরে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় তাহাই জ্বর, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হইয়াই যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু ক্রোধের বেগ না থাকিলে কি যুদ্ধ করা, শত্রুকে হনন করা সম্ভব? ক্রোধের দ্বারা আমাদের শরীরেব বল বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়, সেই বলেই আমরা শত্রুকে জয় করিতে পারি, ক্রোধ না থাকিলে আমরা কেমন করিয়া যুদ্ধ করিব? রক্তপাত ও হত্যা করিতে আমাদের মন, আমাদের ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ বিমুখ; ক্রোধের দ্বারা যে বিপ্লব উপস্থিত হয় তাহাতেই এই বিমুখতা দূর হইয়া যায়, আমরা উৎসাহের সহিত শত্রুর বক্ষে ছুরিকাঘাত করি। কিন্তু গীতা বলিয়াছে, এইভাবে শত্রু হনন করিলেই তাহা পাপ হয়। মুক্ত পুরুষ এইরূপ কাম বা ক্রোধের বশে কর্ম্ম করেন না, যুদ্ধ করেন না, তাই তাঁহার কোন পাপই হয় না। হত্বাঽপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে,—তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না, অথবা তজ্জন্য ফলভোগী হন না। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার কেহ শত্রু নাই, তাঁহার প্রতি কেহ শত্রুতা আচরণ করিয়াছে বলিয়া তিনি কাহাকেও জয় করিতে বা বধ করিতে চান না, তিনি শুধু দেখেন ঘটনাচক্র কাহাদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছে, ভগবানের অলঙ্ঘ্য বিধানে যাহা সম্পাদিত হইতে চলিয়াছে তাহার বিরোধিতা করিয়াই কাহারা তাহাতে সাহায্য করিতেছে। "তাঁহাদের প্রতি তাঁহার কোনরূপ ক্রোধ বা বিদ্বেষ ভাব থাকিতে পারে না; কারণ দিব্য প্রকৃতিতে ক্রোধ বা বিদ্বেষের স্থান নাই। বাধা মাত্রকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার, ধ্বংস করিবার যে প্রবৃত্তি অসুরের মধ্যে আছে, যে ভীষণ রক্ত পিপাসা রাক্ষসের মধ্যে

আছে (এবং অসুর ও রাক্ষসের প্রভাবের অধীন মানুষের মধ্যেও যে ধ্বংস প্রবৃত্তি ও রক্ত পিপাসা দেখা যায়), তাঁহার ধৈর্য্য, শান্তি এবং সর্ব্বতোমুখী সহানুভূতি ও জ্ঞানের মধ্যে সে-সব অসম্ভব। তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চান না, বরং সকলের প্রতিই তাঁহার বন্ধুভাব ও করুণা, অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে অনুকম্পার বশে রক্তপাত করিতে নিবৃত্ত হয়, তাহার হৃদয় তাহার স্নায়ু তাহার ইন্দ্রিয়সকল কাতর হইয়া উঠে, মুক্ত পুরুষের এই করুণা তাহা হইতে ভিন্ন জিনিষ, তাহার প্রসারিত চৈতন্যের মধ্যে তিনি সকল জীবকেই গ্রহণ করেন, সকলের সঙ্গে একত্ব অনুভব করেন—এই ঐক্যবোধ ও সহানুভূতিই তাঁহার করুণার ভিত্তি। আর তিনি এই স্থূল শরীরের জীবনটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ বলিয়া মনে করেন না। ইহার ঊর্দ্ধে যে অধ্যাত্ম জীবন সেই দিকেই তিনি লক্ষ্য রাখেন, এবং এই শারীরিক জীবনকে কেবল তাহার আধার মাত্র বলিয়াই জানেন। তিনি সহসা হত্যাকাণ্ড বা যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন না, কিন্তু ধর্ম্মের স্রোতে যদি যুদ্ধ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎপদ হন না, উদার সমতা ও পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং যাহাদের শক্তি ও পরের উপর প্রভুত্ব করিবার উল্লাস তাহাকে নষ্ট করিতে হয় তাহাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির কোন অভাব হয় না।" —শ্রীঅরবিন্দের গীতা

কিন্তু ক্রোধ যদি না থাকে তাহা হইলে মানুষ যুদ্ধ করিবার শক্তি পাইবে কোথা হইতে? মানুষ যাহাতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার শক্তি পায়, সেই জন্যই ত প্রকৃতি তাহার মধ্যে ক্রোধের বেগ দিয়াছে, সেই বেগ দূর করিলে সে কি যুদ্ধ করিবার, আত্মরক্ষা করিবার প্রেরণা ও শক্তি হারাইয়া বিনষ্ট হইবে না? এরূপ প্রশ্ন ভ্রান্ত ধারণা হইতেই উৎপন্ন, যোগের ইহাই একটি বিশিষ্ট কৌশল যে এ-বিষয়ে প্রকৃত সত্যটি সে দেখাইয়া দিয়াছে, মানুষের সকল কর্ম্ম-শক্তির প্রকৃত উৎস কোথায় তাহা দেখাইয়া দিয়াছে। কাম ও ক্রোধ হইতেছে নিম্নতন স্তরের জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার প্রাকৃত কৌশল। পশু হইতেছে তামসিক স্তরের জীব, তাহাদের মধ্যে মন, বুদ্ধি, চৈতন্যের আলোক বিকশিত হয় নাই, যন্ত্রবৎ চালিত না হইলে তাহারা কর্ম্ম করে না, কর্ম্ম করিতে পারে না, তাই প্রকৃতি তাহাদিগকে কাম ক্রোধ দিয়া অন্ধভাবে যন্ত্রবৎ চালিত করে। কোন একটি কল টিপিয়া দিলেই তাহার বিশিষ্ট ক্রিয়াটি

যেমন অনিবার্য্য ভাবে আপনা হইতেই সম্পাদিত হয়, তাহার জন্য কাহারও মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না, পশুগণ কাম ক্রোধের বশে ঠিক সেইভাবেই চলে, কাম বা ক্রোধের উত্তেজক কারণ উপস্থিত হইলে তাহারা অনিবার্য্য ভাবেই তাহার দ্বারা চালিত হয়, এবং এইভাবেই প্রকৃতির কার্য্য চলিতে থাকে। কিন্তু মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের অধিকতর প্রকাশ হইয়াছে, মানুষের আছে হৃদয়, মন, বুদ্ধি—এখানে আর সেই পশু-স্তরের যান্ত্রিক ক্রিয়ার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই, পরন্তু এখানে তাহা ঊর্দ্ধতন বিকাশের পরম বিঘ্নস্বরূপ। মানুষের মনুষ্যত্ব হইতেছে এই যে, তাহার সকল কর্ম্মের প্রেরণা আসিবে তাহার বুদ্ধি হইতে। আর যান্ত্রিক ইন্দ্রিয় ভোগে পশু যে সুখ পায়, তৃপ্তি পায়, মানুষের তৃপ্তি তাহাতে নাই, মানুষ চায় হৃদয়, মন, বুদ্ধির উচ্চতর ভোগ, দেহ কেবল তাহার উপলক্ষ্য ও আধার হইতে পারে। অবশ্য সকল মানবের মধ্যেই এই উচ্চভাবের বিকাশ হয় নাই; মানুষ ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে যে পশু-স্তর হইতে উঠিয়াছে, তাহার অনেক অভ্যাস ও সংস্কার এখনও তাহার মজ্জাগত রহিয়াছে, তাই সে মনে করে কাম ও ক্রোধ তাহার স্বভাব, তাহার প্রকৃতি। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিদের এই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে, তাঁহারা উচ্চতর জ্ঞান, কর্ম্ম ও আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন, তাই তাঁহারা আর এই নিম্নতন ইন্দ্রিয়ভোগে তৃপ্তি পান না, ন তেষু রমতে বুধঃ।

ক্রোধ হইতে বল বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু তাহা সাময়িক; শীঘ্রই তাহা প্রতিক্রিয়ায় অবসাদ আনয়ন করে, এবং ক্রোধের সময় যে উত্তেজনা ও বিক্ষোভ হয় তাহাতে মানুষের দিক বিদিক জ্ঞান থাকে না, সে অবস্থায় কোন কর্ম্মই সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। মানুষকে যুদ্ধ করিতে হইলেও ক্রোধের সহিত যুদ্ধ করা প্রকৃত কৌশল নহে। পশু নখ-দন্ত লইয়া যুদ্ধ করে, প্রত্যেক পশুর যুদ্ধের একটি বিশিষ্ট ধারা আছে, প্রকৃতি তাহাকে সেই ধারায় যন্ত্রবৎ চালিত করে, অতএব ক্রোধের বেগ হইতে তাহার সাহায্যই হয়। কিন্তু মানুষের যুদ্ধের মধ্যে বুদ্ধির স্থানই অধিক, শান্ত স্থির একাগ্রভাবে যে যুদ্ধ না করিবে তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; যে ব্যক্তি ক্রোধে বিচলিত তাহার লক্ষ্য স্থির হয় না এবং শীঘ্রই সে অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই জন্যই গীতা বলিয়াছে, যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ, কাম ক্রোধ প্রভৃতির উত্তেজনা হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর। শক্তি আসিবে ঊর্দ্ধ হইতে। বস্তুতঃ সকল শক্তির মূল

হইতেছে ইচ্ছা শক্তি, Will force. যখন কোন কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝি, তখন তাহার সম্পাদনে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেই প্রয়োজনীয় বল পাওয়া যায়। আর যখন আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে ভগবানের ইচ্ছাশক্তির সহিত যুক্ত করি, নিজদিগকে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদনের যন্ত্র করি, তখন আমাদের ভিতর দিয়া ভগবৎ শক্তি সাক্ষাৎভাবে কর্ম্ম করে, সে-শক্তি সকল শত্রু, সকল বাধাকে জয় করে অবহেলায়, অব্যর্থ ভাবে। কবি বলিয়াছেন,

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।

কাম ক্রোধের বিক্ষোভ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া, ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ অভ্যাস করিয়া জগতে তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য তাঁহার শক্তিতে তাঁহার যন্ত্ররূপে আমরা যখন যুদ্ধ বা অন্য কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তখনই তাহা নিখুঁতভাবে, অব্যর্থভাবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়, তাই গীতা বলিয়াছে, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।

যেমন ক্রোধ সম্বন্ধে, কাম সম্বন্ধেও সেইরূপ। পশু কামের প্রেরণায় যৌন-সংসর্গে প্রবৃত্ত হয়; যে-মানুষের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে সে ইহাতে তৃপ্তি পায় না, দেহের মিলন, দেহের জীবনটাকেই সে বড় করিয়া দেখে না, সে চায় পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে প্রাণের সহিত প্রাণের, মনের সহিত মনের, আত্মার সহিত আত্মার মিলন—দেহের মিলন সেখানে গৌণ, তাহা কামের উত্তেজনা হইতে আইসে না, তাহা আইসে প্রেমের আনন্দ হইতে। যে কামকে সম্পূর্ণভাবে জয় না করিয়াছে, সে কখনই এই প্রেমের আস্বাদ পায় না। কামের বশে দেহের মিলনে যে-সুখ তাহা পাশবিক, অতি ক্ষণস্থায়ী, দেহমনের অবসাদজনক, সে-সুখের আদি আছে অন্ত আছে, তাহা মানুষকে মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়। আর প্রেমের বশে মিলনের যে-আনন্দ তাহা এই অশুদ্ধ পাশবিক ইন্দ্রিয়ভোগের বহু উর্দ্ধে, তাহার আনন্দ কখনও ফুরায় না। কবি ইহার বর্ণনা করিয়াছেন,

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়?
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয়!

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ—
নয়ন না তিরপিত ভেল!
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল!

ইহাই হইতেছে আত্মানন্দের স্বরূপ, তিলে তিলে নূতন হয়, কারণ আত্মা অনন্ত, তাহার আনন্দ-ভোগের বৈচিত্র্যও অনন্ত। আমাদিগকে চলিতে হইবে রাজসিক কামের প্রেরণায় নহে, পরন্তু আত্মার গভীর প্রেরণায়; আমাদের সকল কর্ম্ম, সকল ভোগের প্রেরণা আসিবে সাক্ষাৎভাবে আত্মা হইতে, তখনই আমরা এই স্থূল দেহের মধ্যেই অমৃতের আস্বাদ পাইব। সেজন্য সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে রাজসিক কাম হইতে মুক্ত হইতে হইবে, যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি…অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে —বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬,৭

স্ত্রী-পুরুষের মিলন যে সম্পূর্ণভাবে কামভাবশূন্য হইতে পারে, চণ্ডীদাস তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,

রজকিনী প্রেম
নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়।

এইরূপ প্রেম সুলভ নহে, ইহার জন্য অনেক সাধনা করিতে হয়, ঊর্দ্ধের ভাগবত শক্তির সহিত ঐকান্তিক যোগ সাধনা করিয়া রাজসিক কাম ক্রোধের সকল বেগ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে হয়। এই প্রেমের ভিত্তি হইতেছে আত্মার সহিত আত্মার মিলন। দেহের মিলন যাহার তাহার সহিতই হইতে পারে, যেমন পশুদেব হয়, কিন্তু আত্মার মিলনের জন্য অনেক তপস্যা করিতে হয়,

বিদ্যাপতি কহে—প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক।

কালিদাস তাঁহার কাব্য ও নাটকে দেখাইয়াছেন, প্রকৃত প্রেম তপস্যালব্ধ বস্তু, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে জয় না করিলে তাহা লাভ করা যায় না; এ প্রেমের মিলন ক্ষেত্র তাই মুনি ঋষির আশ্রম, পার্ব্বতীর তপোবন।

অতএব কাম ক্রোধ হইতে মুক্ত হইলেই আমরা যে জীবন-শূন্য জড় ইট পাথরের মত হইয়া যাইব তাহা নহে। বস্তুতঃ নীচের প্রকৃতিতে যাহা রজঃগুণ, উর্দ্ধে ভাগবত প্রকৃতিতে তাহাই তপঃশক্তি; নীচের প্রকৃতির কাম ক্রোধাদি বিকার হইতে মুক্ত হইলে আমাদের মধ্যে যে তপঃশক্তির বিকাশ হইবে, তাহারই কল্যাণে আমরা হইব দিব্য কর্ম্মী, দিব্য জীবন ও দিব্য আনন্দের অধিকারী।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪

অন্বয়—যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ সঃ এব যোগী ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ অধিগচ্ছতি।

অনুবাদ—যাহার অন্তরে সুখ, যাহার অন্তরে আরাম ও শান্তি, যাহার অন্তরেই আলোক, সেই যোগী ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা

সাধারণ মানুষ বহির্মুখী, সে তাহার সুখের জন্য, আরামের জন্য, জ্ঞানের জন্য বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে; কিন্তু প্রকৃত সুখ ও শান্তি ও জ্ঞানের উৎস রহিয়াছে বাহিরে নহে অন্তরে, আমাদের আত্মার মধ্যে। কমলাকান্ত গাহিয়াছেন,

আপনাতে আপনি থেকো মন
যেয়ো না রে কারও দ্বারে,
যা চাবি তা বসে পাবি
খোঁজ না নিজ অন্তঃপুরে।

সাধারণ মানুষ সুখের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাহ্য বস্তুকে সুখের আকর বলিয়া ধরিতে চায়, অধিকার করিতে চায়—এই ভাবেই আসে বাসনা এবং তাহা হইতে কাম ক্রোধের বিক্ষোভ, সুখ দুঃখ, শুভ অশুভ, ভাল মন্দের দ্বন্দ্ব। বাহ্য বস্তুর মধ্যে সুখ শান্তির আশা করা হইতেছে মরীচিকায় জলের আশা করার ন্যায় নিরর্থক। যোগীরা ইহা বুঝেন, তাই তাঁহারা বাহ্য-বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া অন্তর্মুখী হন, নিজের মধ্যে আত্মার সন্ধান করেন,

ইহাই অধ্যাত্ম জীবনের আরম্ভ। এইরূপ যোগ সাধনার দ্বারা যখন আমরা আত্মার চৈতন্যে প্রবেশ লাভ করি, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হই—তখন আনন্দ ও শান্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়, কারণ আনন্দ ও শান্তি হইতেছে অধ্যাত্ম চৈতন্যের অন্তর্নিহিত, দিব্য প্রকৃতির স্বরূপ—তাহা কোন বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না।

সাধারণ মানুষ ইহা বুঝে না। সকল আনন্দের উৎস তাহার অন্তরের মধ্যেই রহিয়াছে, তাই তাহার আনন্দ-ভোগের আকাঙ্ক্ষা এমন অসীম অনিবার্য—কিন্তু নিজের মধ্যেই তাহার সন্ধান না করিয়া অজ্ঞানের বশে সে বাহিরের দিকে ধাবিত হয়,

নিজ নাভি গন্ধে মত্ত　　মৃগ ইতস্তত:
ঘুরে মরে বনে বনে
তেমি তোমায় হৃদে ধরে　আকুল তোমার তরে
(আমরা) ঘুরে মরি ভব বনে।

যাঁহারা মানুষকে অন্তর্মুখী হইবার প্রেরণা দেন, পন্থা দেখাইয়া দেন তাঁহারাই মানুষের পরম সুহৃদ। ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভারতবাসীর এই মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকল বিষয়-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসীকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, অধ্যাত্ম-চৈতন্যের মধ্যে, অধ্যাত্ম-জীবনের মধ্যে যে পরম আনন্দ ও শান্তি রহিয়াছে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই বার্ত্তা আনিয়া দিয়াছেন।

ভারতে এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইতেছেন গৌতম বুদ্ধ। তাঁহার পূর্ব্বে সন্ন্যাস চতুর্থ আশ্রম বলিয়া গণ্য হইত, শেষ বয়সে মানুষ সংসার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আত্মচিন্তায়, আত্মধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে—এই ভাবে অধ্যাত্ম জীবন বা মোক্ষের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবে—ইহাই ছিল ভারতের প্রাচীন বৈদিক আদর্শ। তবে ইহা সম্ভবত: আদর্শ মাত্রই ছিল, ইহার দ্বারা মানুষ বুঝিত যে অধ্যাত্ম জীবনই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, সাংসারিক জীবন মানুষকে কেবল সেই লক্ষ্যের জন্য ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া তোলে। কার্য্যতঃ খুব কম লোকই শেষ বয়সে সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিত। সংসারে থাকিয়া বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করাতেই মানুষের জীবন পর্য্যবসিত হইত। পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনি এমনও বলিয়াছেন যে, মুক্তি বা মোক্ষের জন্য ইহার অধিক আর কিছুই প্রয়োজন নাই—সংসারে

থাকিয়া শাস্ত্রসঙ্গত ভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিলেই মানুষ ইহকালে সুখ ও শান্তি ও পরকালে পরমগতি লাভ করিতে পারে।

বৈদিক যাগযজ্ঞের যে একটা নিগূঢ় লক্ষ্য ছিল, মানুষকে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী করা, অধ্যাত্ম জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলা, মানুষ ক্রমশঃ তাহা ভুলিয়া যায়, বাহ্য আচার অনুষ্ঠানকেই সব বলিয়া মনে করে এবং এইভাবে বৈদিক ধর্ম্মে নানা গ্লানি প্রবেশ করে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতেছে ইহারই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধ বলিলেন, বাহিরের অনুষ্ঠানের দ্বারা নহে, অন্তরের সাধনার দ্বারাই মানুষ পরম মুক্তি ও আনন্দ লাভ করিবে আর সে আনন্দ মর্ত্ত্যে বা স্বর্গে কোন বাহ্য জীবনে নাই, তাহা আছে সেই বাহ্য জীবনের নির্ব্বাণ বা বিনাশে। মানুষ বেদের দোহাই দিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পশু বলিদানের ন্যায় নৃশংস অনুষ্ঠানকে সমর্থন করে, শাস্ত্রের অর্থ লইয়া নানা বাক্ বিতণ্ডা করিয়া প্রকৃত সত্যকেই হারাইয়া ফেলে, তাই বুদ্ধ বেদাদি শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া নিজ প্রত্যক্ষ সাধনালব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞানের আলোকেই মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই এই সব বিষয়ে বুদ্ধের সহিত গীতার বেশই মিল রহিয়াছে। তবে গীতা বুদ্ধের ন্যায় বেদকে অগ্রাহ্য করে নাই, পরন্তু লোকে বেদের যে বিকৃত ব্যাখ্যা করে সেই বেদবাদেরই নিন্দা করিয়াছে। যখন বুদ্ধের ন্যায় কোন অধ্যাত্ম-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ সম্মুখে বিদ্যমান থাকেন তখন শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন না থাকিতে পারে, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। কিন্তু, অন্যত্র মানুষকে শাস্ত্রের সাহায্যেই জ্ঞান লাভ করিতে হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিতে হয়, কেবল মনে রাখিতে হয় যে শাস্ত্র কেবল সহায় মাত্র, উহার অপব্যবহার হইতে পারে, শাস্ত্রের নানা মত ও ব্যাখ্যার দ্বারা মানুষের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইতে পারে, শ্রুতিবিপ্রতিপন্না। অতএব শেষ পর্য্যন্ত মানুষকে নিজের অন্তরের আলোকের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে, অন্তর্জ্যোতি হইতে হইবে, নিজের অধ্যাত্ম অনুভূতি উপলব্ধির আলোকে সকল সত্যকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই বুদ্ধ নিজে কোন শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিলেও, তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার বচনগুলিই শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছিল—এবং সেই সব বচন লইয়া শত শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধগণের মধ্যে কত বাক্ বিতণ্ডা হইয়াছে, কত মত, কত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বুদ্ধের ন্যায় গীতা বৈদিক যজ্ঞকেও একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই। তবে লোকে যে বেদের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া স্বর্গাদি ভোগ লাভের জন্য ক্রিয়া-বিশেষবহুল যজ্ঞ করে তাহারই নিন্দা করিয়াছে এবং যজ্ঞের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছে—তাহা হইতেছে সকল কর্ম্মকেই যজ্ঞরূপে ভগবানে সমর্পণ করা, যেন এইভাবে প্রকৃতির শুদ্ধি ও রূপান্তর সাধিত হয়। গীতা দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে—বাহ্য আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা অন্তরের সাধনার উপরেই জোর দিয়াছে। তথাপি গীতা বাহ্য অনুষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করে নাই—বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা আভ্যন্তরীণ সাধনাতে সাহায্য হইতে পারে—এবং বাহ্য যাগযজ্ঞাদির ইহাই সার্থকতা। কিন্তু সে-সব অনুষ্ঠান যদি বাহ্যাড়ম্বরে পূর্ণ হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহাদের উপযোগিতা নষ্ট হয়—তাই গীতা বাহ্যানুষ্ঠানকে যতদূর সম্ভব অনাড়ম্বর করিতে বলিয়াছে। ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণই মূল প্রয়োজনীয় জিনিষ, তাহারই প্রতীক স্বরূপ পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহাই ভক্তিভবে ভগবানকে অর্পণ করা হয় তাহাই হয় যজ্ঞ।

বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁহার শিক্ষা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে অতিশয় বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার ফলে লোকে হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু-সভ্যতার মূল উৎস বেদ ও উপনিষদে আস্থা হারাইতেছিল। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই হিন্দু দার্শনিকগণ বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে অনেক যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "অধিক কি বলিব, এই বৌদ্ধমতের যুক্তিযুক্ততা স্থাপনের নিমিত্ত যে দিক দিয়াই পরীক্ষা করা যায়, সর্ব্ব প্রকারেই ঐ মত বালুকাস্তূপের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া যায়, ইহার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না। বাহ্যার্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ, পরস্পরবিরুদ্ধ এই তিনটি বাদ উপদেশ করিয়া বুদ্ধদেব নিজের অসম্বন্ধ প্রলাপিত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন, অতএব এই মত মুমুক্ষুদিগের সর্ব্বপ্রকারেই অগ্রাহ্য"।

কিন্তু বাস্তবিকই বুদ্ধ যদি অসম্বন্ধ প্রলাপই বকিয়া থাকিতেন তাহা হইলে "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধজগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যার" থাকিত না। এক শ্রুতি হইতে যেমন পরস্পর-বিরোধী নানা হিন্দু দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে, তেমনই

বুদ্ধের বচন হইতে পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ আপন আপন ব্যাখ্যা দিয়া নানা মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন—সে-জন্য বুদ্ধকে দায়ী করা যায় না, মানুষের অজ্ঞ অসম্পূর্ণ বুদ্ধিই এই সব অসামঞ্জস্য ও বিরোধের জন্য দায়ী। আর বস্তুতঃ বুদ্ধ যে সাধনমার্গ দেখাইয়াছেন তাহা একেবারে নূতন কিছু নহে, তাহার মধ্যে আমরা সাংখ্যের জ্ঞান যোগ এবং পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ যোগকেই ভিন্নরূপে দেখিতে পাই। বুদ্ধ কেন বেদকে স্বীকার করেন নাই, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। লোকে যাহাতে বৃথা তর্ক না করিয়া সহজ সরল সাধনার দ্বারা আত্মোন্নতিতে অগ্রসর হয়—বুদ্ধ সেই শিক্ষা ও প্রেরণা দিয়াছিলেন, এবং তাহা ভারতবাসীর উপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার ফল বহুদূরপ্রসারী হইয়াছে। অতএব তর্কের জাল বুনিয়া বুদ্ধকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা বৃথা। গীতা সে চেষ্টা করে নাই, গীতা যেমন অন্য সকল মত ও সাধনার সারবস্তুটি গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই বৌদ্ধমতেরও সারবস্তু গ্রহণ করিয়াছে, এবং এইভাবে গীতার মধ্যে বেদান্ত ও বৌদ্ধমতের যে সমন্বয় হইয়াছে, এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" কথাটি উপর্য্যুপরি ব্যবহার করিয়া গীতা তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছে।

গীতার ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলেই আমাদিগকে শঙ্করের মতের প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। শঙ্করের প্রতিবাদ আমরাই যে আজ প্রথম করিতেছি তাহা নহে—তাঁহার সমসাময়িক মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি কত মনীষী যে শঙ্করের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই—তাহাতে শঙ্করের অবমাননা করা হয় না। শঙ্কর পরম অধ্যাত্ম সত্যকে যেমন ভাবে দেখিয়াছিলেন, নিজ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—অসাধারণ প্রতিভার সহিত তিনি তাহা সমগ্র ভারতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে বলিয়াছেন, মানুষ মূলতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং এই উপলব্ধিই অধ্যাত্ম সাধনার চরম কথা—ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সত্য আর কিছুই নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের ফলে ভারতে বেদ উপনিষদে প্রচারিত এই সত্য ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল—পুনরায় যে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় সে জন্য শঙ্করের কৃতিত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—সেইজন্য আজও ভারতবাসী শ্রদ্ধায় তাঁহার প্রতি মস্তক অবনত করিতেছে। সকল মহাপুরুষই আসেন নিজ নিজ যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে; শঙ্কর তাঁহার কাজ প্রকৃষ্ট-

ভাবেই করিয়াছিলেন। কিন্তু আজিকার যুগের প্রয়োজন হইতেছে, শঙ্কর যে সত্যকে দেখিয়াছিলেন সেইটিকে আরও পূর্ণতর ভাবে দেখা। তিনি বলিয়াছেন, জীব ব্রহ্ম। কিন্তু জগৎও ব্রহ্ম, সর্ব্বং খলু ইদম্ ব্রহ্ম—ইহাও উপনিষদেরই বাণী, এই বাণীটির উপর তিনি সম্যক দৃষ্টি দেন নাই—তিনি বলিয়াছেন, জগৎ মিথ্যা। আমরা উপনিষদকেই অনুসরণ করিয়া বলিতেছি, জগৎকে সাধারণতঃ আমরা যে চক্ষুতে দেখি, ভেদ ও দ্বন্দ্বে পূর্ণ, অনিত্যং অসুখং লোকং, ইহা মিথ্যা মায়া বটে—কিন্তু জগৎ মূলতঃ মিথ্যা নহে, ইহা ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি, সমস্তই ভগবানের বিভূতি, ভগবানের অংশ। গীতায় এই সত্যটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

শঙ্করের কাজ ছিল বাহিরের জগতের সত্যের সন্ধান করা নহে, অন্তর্জগতের সত্যের সন্ধান করা—ইহার জন্য মনকে বাহির হইতে ফিরাইতে হয়, বাহ্য বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু বাহিরের জগৎকেই যাহারা পরম সত্য বলিয়া ধরিয়া রহিয়াছে তাহাদের পক্ষে সেই আসক্তি পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে, সেইজন্যই তাঁহাকে জগৎ মিথ্যা এই তথ্যটির উপরেই বিশেষ ভাবে জোর দিতে হইয়াছিল।* আর এই বিষয়ে বৌদ্ধেরাই পথ দেখাইয়াছিলেন। বাহ্য জগতের কোন অস্তিত্বই নাই, উহা শুধু মনের ভ্রম, উহা স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অলীক—এই মতটি বৌদ্ধগণই প্রথম প্রচার করেন। আমরা দেখিতে পাই ব্রহ্মসূত্রে এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে—ব্রহ্মসূত্র শ্রুতিপ্রমাণ হইতে দেখাইয়াছে জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, জন্মাদ্যস্য যতঃ, ব্রহ্মই এই জগৎ হইয়াছেন, অতএব ইহা মিথ্যা হইতে পারে না।

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥

ব্রহ্মসূত্র ২।২।২৯

অর্থাৎ বৌদ্ধগণ যে বলেন, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় জাগরিতাবস্থায় দৃষ্ট পদার্থের মূলেও কোন বাহ্য বস্তু নাই, স্বপ্ন ও জাগরণ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত মত অসিদ্ধ। স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান হয় তাহা নিদ্রাদি দোষে দূষিত ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ঐ জ্ঞান পরে বাধিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আর জাগরিতাবস্থায় জ্ঞান ঠিক তাহার বিপরীত, তাহা কোন

* বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন, জগৎ সত্য, কেবল মানুষের মনে বৈরাগ্য আনয়ন করিবার জন্যই জগৎকে মিথ্যা বলা হয়।

অবস্থাতেই বাধিত হয় না। অতএব উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই শঙ্কর যুক্তির দ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার প্রয়াস করিলেও, "জগৎ মিথ্যা" এই মতটি তিনি প্রকারান্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য অনেকেই তাঁহাকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য শঙ্কর বৌদ্ধমতের সহিত নিজ মতের একটি অতি সূক্ষ্ম প্রভেদ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদের ন্যায়ই তিনি বলিয়াছিলেন বাহ্য জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, উহা সত্য নহে—তবে তিনি বাহ্য জগৎকে একেবারে স্বপ্নের ন্যায় অলীক বলেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন মায়াশক্তি এই ভ্রমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করে। আমরা যখন বাহিরে স্তম্ভাদি দেখি, আমরা বাস্তবিকই বাহিরে একটা বস্তু দেখিতে পাই, স্বপ্নের ন্যায় তাহা আমাদের মনের সৃষ্টি নহে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাহা বিলীন হইয়া যায় না—কিন্তু ঐ বস্তু প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট হয় নাই, ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই আছেন, বস্তুতঃ জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, তবে মায়াশক্তি একটা ভ্রমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করে—যেমন মরুভূমিতে জল না থাকিলেও অনেক লোক একই সময় জাগ্রতাবস্থায় একস্থানে জল রহিয়াছে বলিয়া দেখিতে পায়—তখন কিছুতেই সে দৃশ্যকে দূর করা যায় না। কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে, কিছুক্ষণ পর আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যায়, অতএব তাহা সত্য বস্তু নহে, মায়াসৃষ্ট বস্তু, মায়ার শেষ হইলেই তাহারও শেষ হয়। জগৎ রহিয়াছে, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, কিছুতেই এই দৃষ্টি ব্যাহত হয় না, অতএব ইহা সৎ; কিন্তু মায়া দূর হইলে জগৎও লোপ পায়, অতএব ইহা অসৎ। তাই শঙ্করের মতে মায়া-সৃষ্ট জগৎ হইতেছে সৎ ও অসৎ উভয়ই। বৌদ্ধগণ বলেন জগৎ অসৎ, শঙ্কর বলেন জগৎ সৎ অসৎ দুইই।

কিন্তু এইরূপ একটা তর্কগত সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকিলেও শঙ্কর জগৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধমতই কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন—সংসার মায়া, মিথ্যা—সংসার হইতে সরিয়া যাওয়াই পরম পুরুষার্থ, নিঃশ্রেয়স্, মুক্তি—এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। শঙ্কর যে প্রকারান্তরে বৌদ্ধমতই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এযুগে শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার "অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা" গ্রন্থে তাহা ভালভাবেই দেখাইয়া দিয়াছেন, সেখানে তিনি শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রুতি ও যুক্তি অনুমোদিত ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "অবিদ্যাকে জগৎকারণ বলিতে গেলে যে পরিমাণে সৎ, সেই পরিমাণে স্বগত

ভেদ স্বীকার করিতে হয়, এবং যে পরিমাণে অসৎ, সেই পরিমাণে বৌদ্ধবাদে উপনীত হয়।...জগৎ কখনও রচিত হয় নাই, ইহা কল্পনার বিজৃম্ভণ মাত্র, ইহা বলা আর বৌদ্ধের মত জগৎ অসন্মূল বলা একই কথা।"

তবে শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিলেও ব্রহ্মকে সত্য বলিয়াছেন, এইখানেই বৌদ্ধগণের সহিত তাঁহার দার্শনিক মতের বিশেষ প্রভেদ, কারণ বৌদ্ধগণ ব্রহ্ম বলিয়া কোন নিত্য শাশ্বত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তবে বুদ্ধ স্বয়ং ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ "পালিপিটকে" আমরা বুদ্ধের যে পরিচয় পাই তাহাতে তাঁহার নিকট পরাবিদ্যা অব্যাকৃত বস্তু অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষয়ই নহে,—দুঃখ হইতে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করাই তাঁহার এক-মাত্র উদ্দেশ্য। বুদ্ধাবিষ্কৃত যে চারিটি আর্য্য সত্যের উপর সমস্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন প্রতিষ্ঠিত তাহা এই—দুঃখ আছে, দুঃখের কারণও আছে, দুঃখ নিবৃত্তিও সম্ভব, এবং সেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও আছে। এই দুঃখের কারণ তৃষ্ণা অর্থাৎ কামনা, বাসনা, desire। এই তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলেই দুঃখ আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে এবং তাহাই নির্ব্বাণ। কিন্তু নির্ব্বাণের প্রকৃত স্বরূপ কি, নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে, কিছুই থাকিবে কিনা—এ-সব সম্বন্ধে বুদ্ধ নিজে কিছু না বলিলেও বৌদ্ধগণ নানা মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে সাধারণতঃ বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মের অথবা সাংখ্যের মুক্ত পুরুষের বিশেষ কোন তফাৎ নাই। অধ্যাপক বটকৃষ্ণ ঘোষ বলিয়াছেন, "মহাযানী দর্শনের শূন্য কথাটি সাধারণতঃ void বলিয়া অনুবাদ করা হইয়া থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় ইহা ঠিক নহে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে শূন্যবাদ সম্বন্ধে যে অনন্ত আলোচনা আছে তাহা হইতে কিছুতেই মনে হয় না যে সর্ব্বসত্বের অভাবের নামই শূন্য। শূন্য কথাটির প্রকৃত অর্থ গুণশূন্য। বেদান্তে যাহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, মহাযানী দর্শনে তাহারই নাম শূন্য। ব্রহ্ম ও শূন্য একই বস্তু,—উভয়েরই অর্থ Ding au sich বা স্বলক্ষণ বস্তু।" জন্ম মৃত্যু দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া যে পদ লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিয়াছেন তাহা অজাতম, অভূতম্, অকলম্, অসংখতম্ (বিশুদ্ধিমাগ্‌গ, উদান ৮)। ইহা সর্ব্ব সত্বের অভাব নহে, ইহা বেদান্তেরই নির্গুণ ব্রহ্ম, কেবল বুদ্ধ ইহাকে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করেন নাই, ইহার কোন নামই দেন নাই, কেবল বলিয়াছেন যে ইহা হইতেছে সর্ব্বদুঃখের মূল অহংবোধের নির্ব্বাণ।

বৌদ্ধগণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব অনাত্মবাদ। ধর্ম্মপাদে বুদ্ধদেব বলিতেছেন—

সব্বে সংখারা অনিচ্চা
সব্বে সংখারা দুক্‌খা,
সব্বে ধম্মা অনাত্তা

নৈসর্গিক বস্তুমাত্রই সংখাত (conditioned or compounded) এবং তাহারা অনিত্য ও দুঃখময় *। কেবল নিব্বাণ অসংখাত। সুতরাং নির্ব্বাণ নিত্য ও অদুঃখময়। কিন্তু এই অসংখাত নির্ব্বাণও অনাত্ম।

এই অনাত্ম শব্দের অর্থ একেবারে বিনাশ বা সর্ব্বসত্তাশূন্যতা নহে। আত্মা বলিতে বৌদ্ধগণ অহং (ego) বুঝিয়াছে—তাহাদের মতে কোন জীবাত্মা বা ব্যষ্টিগত সত্তা (individual soul) নাই। আমরা যাহাকে অহং বলি তাহা ভ্রম মাত্র এবং ইহাই সকল বাসনার কেন্দ্র ও দুঃখের মূল—সর্ব্বদা অনাত্মতা ধ্যানের দ্বারা এই অহংভাবের বিনাশ বা দুঃখলেশশূন্য পরম শান্তিময় অবস্থা লাভ করা যায়। এখানেও আমরা দেখিতে পাইতেছি বৌদ্ধমতের সহিত শঙ্করের মতের মূলতঃ কোন ভেদই নাই, কারণ শঙ্করও ব্যষ্টিগত সত্তা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন ব্রহ্ম ছাড়া জীব বলিতে আব কিছুই নাই—আমরা যাহাকে অহং বলি তাহা অবিদ্যা বা অজ্ঞানপ্রসূত। যখন এই অজ্ঞান দূর হইবে তখন জীবে আর ব্রহ্মে বিন্দুমাত্র ভেদ থাকিবে না।

বৌদ্ধগণ কোন শাশ্বত সত্তা স্বীকার করেন না ইহা ধরিয়া লইয়াই শঙ্কর তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন, তাহাদিগকে "বৈনাশিক" বলিয়াছেন—কিন্তু আমবা উপরে দেখিলাম, বস্তুতঃ বৌদ্ধরা বিনাশবাদী বা উচ্ছেদবাদী নহেন, তাঁহারা বেদ ও উপনিষদকে প্রামাণ্য বলিযা স্বীকার করেন না এবং সেইজন্য ব্রহ্ম শব্দটিও ব্যবহার করেন না—কিন্তু মূলতঃ তাঁহাদের মত শ্রুতিরই অনুযায়ী, ইহা বুঝাইবার জন্যই গীতা এই শ্লোকে নির্ব্বাণের সহিত ব্রহ্ম শব্দটি যোগ করিয়া দিয়াছে। শঙ্কর ইহা লক্ষ্য করেন নাই, গীতা কেন বারবার তিনবার এখানে নির্ব্বাণ শব্দটি ব্রহ্মের সহিত যুক্ত

* গীতাও ঠিক এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে, অনিত্যং অসুখং লোকম্।

করিয়া ব্যবহার করিল শঙ্কর তাহার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই—তিনি নির্ব্বাণ শব্দের শুধু সাধারণভাবে "মোক্ষ" বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি শঙ্কর যতই বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করুন—মূলতঃ তাঁহার মতের সহিত বৌদ্ধমতের বিশেষ কোন তফাৎই নাই, বিরোধ কেবল প্রধানতঃ ভাষা ও কথা লইয়াই। আর শঙ্কর যে দিগ্বিজয় করিতে পারিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতে নিজ মত প্রবলভাবে চালাইতে পারিয়াছিলেন—তাঁহার পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই সে-জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ভারতে এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কারণ ইহাই হইতেছে খাঁটি আধ্যাত্মিকতা—সমস্ত বাহ্য বিষয়ে, বাহ্যবস্তুতে অনাসক্ত হইয়া অন্তর্মুখী হওয়া, অন্তরের মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও শান্তির সন্ধান করা। পাশ্চাত্য দেশে বৌদ্ধধর্ম্মেরই অনুসরণে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এই মত প্রচার করিয়াছে,—যীশু খ্রীষ্টের কথা, "The kingdom of God is within you"। বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষা—"ঝড়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায়, মুনি তেমনিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁহার কি অস্তিত্ব থাকে?" (ধর্ম্মপাদ মাঘসুত্ত, ১০৭৩)। খ্রীষ্টান ধর্ম্মেরও শিক্ষা—"What is your life? For ye are a vapour that appeareth for a little while and then vanisheth away"—St. James IV. 14. কিন্তু খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিগণের চেষ্টা সত্ত্বেও এই অধ্যাত্মবাদ পাশ্চাত্যদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই—তাহা একটি ক্ষীণধারা রূপেই গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে, বিধাতার বিধানেই পাশ্চাত্য জগৎ বহির্মুখী হইয়াছে, জগৎকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া এই জগতের জীবনকেই পূর্ণভাবে বিকাশ করিবার, ভোগ করিবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এখন আসিয়াছে একটা সমন্বয়ের যুগ। ইহজীবনে দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছিয়া ভারতবাসী বুঝিতেছে যে, আধ্যাত্মিকতাই যথেষ্ট নহে, এমন কি অনেকে আধ্যাত্মিকতাকে ভারতের সকল দুর্গতির জন্য দায়ী করিতেছে। অন্য পক্ষে ভোগবাদ, জীবনবাদ আজ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, পাশ্চাত্য জাতিকে কিরূপ দ্বন্দ্ব ও অশান্তির মধ্যে গভীরভাবে নিমজ্জিত করিয়াছে তাহা দেখিয়া এই ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সেখানে বর্দ্ধিত হইতেছে, অনেকেই বুদ্ধ ও শঙ্করের শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন।

বস্তুতঃ কিছুকাল যাবৎ ভারতে শঙ্করের বেদান্ত মত যে আবার মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ হইতেছে আমাদের দেশের আধুনিক দার্শনিকগণের শিক্ষা হইতেছে পাশ্চাত্য দার্শনিকের নিকট, আর পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ শঙ্করকে খুবই উচ্চ স্থান দিয়াছেন, বস্তুতঃ বেদান্ত বলিতে তাঁহারা শঙ্করের মতই বুঝিয়া থাকেন—আমাদের দেশেও অনেকেই আজকাল তাহাই করিতেছেন।

কিন্তু আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, শঙ্করের ব্যাখ্যাই বেদান্তের একমাত্র ব্যাখ্যা নহে, আর গীতায় আমরা বেদান্তের যে রূপটি দেখিতে পাই, শঙ্করের মায়াবাদের সহিত তাহার মিল নাই। বস্তুতঃ শঙ্কর অপূর্ব্ব ধীশক্তি ও প্রতিভা লইয়া মায়ার যে পরিকল্পনা দিয়াছেন তাহা তাঁহারই নিজস্ব। বৌদ্ধদের ন্যায়ই তিনি ঈশ্বর ও জগৎকে ভ্রান্তিবিলাস রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মকেই এই ভ্রান্তির আশ্রয় বলিয়া তিনি বৌদ্ধদের অসদ্‌বাদ পরিহার করিয়াছেন—এবং এইজন্যই মায়াকে সদসদ্‌রূপা ব্রহ্মশক্তিরূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। ফল হইয়াছে এই যে, জগৎ মিথ্যা—বৌদ্ধদের এই কথা ভারতবাসী হয়ত প্রত্যাখ্যান করিত, কিন্তু শঙ্কর ব্রহ্মের উপর মায়ার প্রতিষ্ঠা করিয়া, শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা জগৎ মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া সেই বৌদ্ধবাদই ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন। আজ আপামর ভারতবাসী সেই বৌদ্ধবাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছে—এই সংসার মিথ্যা মায়া, মানব-জীবনের যে পরম লক্ষ্য তাহা এই সংসারে নহে, এই সংসার ত্যাগ করিয়াই মানুষ পরম গতি লাভ করিতে পারে।

কিন্তু বস্তুতঃ এইটিই ভারতের সমগ্র অধ্যাত্ম আদর্শ নহে। সংসার-ত্যাগ নহে, সাংসারিক জীবনকে গড়িয়া তোলা, দেবগণকে আহ্বান করিয়া এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য স্থাপন করা, ভিতরকে সমৃদ্ধ করিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে বাহিরের জীবনকেও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা—ইহাই ছিল বেদের আদর্শ, এবং বৈদিক যজ্ঞ ছিল ইহারই প্রতীক ও সাধনা। শুদ্ধ আনন্দের সহায়ে সকল মর্ত্ত্যশক্তিকে জয় করিয়া লাভ করিতে হইবে শুদ্ধ মনের মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা, শক্তির, জ্ঞানের, কল্যাণের মূর্ত্ত প্রকাশ—ইন্দ্রের বহু-বিচিত্র পূর্ণতা। ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে ইহাই নানাভাবে বলা হইয়াছে—

আত্বেতা নিষীদতেন্দ্রমভি প্রগায়ত।
সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ॥ ১।৫।১

"হে সখাবৃন্দ! প্রতিষ্ঠার মন্ত্র বহিয়া লইয়া এস, এস এখানে। স্থিরাসনে উপবেশন কর। ইন্দ্রের দিকে চাহিয়া তোল তোমাদের গান।"

পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্য্যাণাং

ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥ ১৫।২

"যাবতীয় বৈচিত্র্য লইয়া ইন্দ্র পরম বিচিত্র, সকল কাম্যের তিনি বিধাতাপুরুষ। একযোগে কর তবে রসের সৃষ্টি।"

স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ স রায়ে স পুরন্ধ্যাং।

গমৎ বাজেভিরা স নঃ ॥ ১।৫।৩

"আমরা যাহা কিছু অধিগত করি, তাহাতে তিনি যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠেন। তিনি মূর্ত্ত হইয়া উঠেন যেন আমাদের আনন্দ সম্পদে, আমাদের বহুল বুদ্ধিতে। তিনি যেন আসেন আমাদের জন্য সকল পূর্ণ ঋদ্ধি লইয়া।" (মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা)।

এই সকল বেদমন্ত্র হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে বলেন বেদ আদিম অশিক্ষিত মানবের ঝাড় ফুঁকের মন্ত্র তাহা নহে—বেদ হইতেছে শ্রেষ্ঠতম কাব্যের ভিতর দিয়া উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্যের প্রকাশ। আবার আমাদের দেশে বেদ যে কেবল বাহ্য যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানেরই গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল তাহাতেও বেদকে ঠিক মত বুঝা হয় নাই। বেদে বাহ্য যজ্ঞের বর্ণনা ও নির্দ্দেশ অবশ্যই আছে—কিন্তু বৈদিক ঋষিগণ ঐ সব বাহ্য যজ্ঞকে আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্যের প্রতীকরূপে ব্যবহার করিতেন—আর যজ্ঞের দ্বারা তাঁহারা শুধু পরকালে স্বর্গ সুখ কামনা করিতেন না, কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের ভিতর দিয়া যাহাতে এই পার্থিব জীবনই দিব্য জীবনে পরিণত হয়—ইহাই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। লোকে ক্রমশঃ এই গূঢ় সত্যটি হারাইয়া ফেলে, গীতা যেমন বলিয়াছে,

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।

উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে, বাহিরের জীবন অপেক্ষা ভিতরের অধ্যাত্ম জীবনকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে উপনিষদের মধ্যেই সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয় (পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। উপনিষদগুলিকেও তাহাদের যুগ অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম যুগের উপনিষদগুলি বেদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী; সেখানে আত্মজ্ঞানকে

প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু পার্থিব জীবন ও কর্ম্মকেও অবহেলা করা হয় নাই। অন্তর্মুখী হইয়া, আত্মার সহিত এক হইয়া আত্মাকে জানিতে হইবে। এইরূপ অন্তর্জ্ঞানের সাধনার দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে, আমাদের যে আত্মা বা মূল সত্তা তাহাতে আমরা সর্ব্বভূতের সহিত এবং ভগবানের সহিত এক, এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সেই অদ্বৈত জ্ঞানের মধ্যে বাস করিতে হইবে, তাহারই আলোকে জীবন যাপন করিতে হইবে। ইহাই উপনিষদের পূর্ণ শিক্ষা—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঈশা প্রভৃতি প্রাচীন উপনিষদগুলিতে আমরা এই শিক্ষাই পাই—সেখানে জ্ঞানলাভের জন্য, মুক্তিলাভের জন্য সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাসের ব্যবস্থা নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায়, জনকরাজার সভায় যাজ্ঞবল্ক্য উপস্থিত হইলে জনক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি গো-ধন গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, না, অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য আসিয়াছেন ?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—"উভয়মেব", হে রাজন, আমি দুই-ই চাই, উভয়মেব (বৃহদারণ্যক ৪।১)। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিয়া অনাসক্ত ভাবে সংসারের ভোগ-ঐশ্বর্য্য পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য শেষ জীবনে সব ছাড়িয়া অনায়াসে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ খণ্ডে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যালাভের পর সংযতেন্দ্রিয় হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবে। ঈশা উপনিষদে বলা হইয়াছে,

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

—এই সংসারে কর্ম্ম করিতে করিতেই এক শত বৎসর বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে।

কিন্তু পরবর্ত্তী উপনিষদগুলি উত্তরোত্তর সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকেই ঝুঁকিয়াছে। জাবালোপনিষদে বলা হইয়াছে, বৈরাগ্যের উদয় হইলে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থ যে কোন আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।

বুদ্ধ হইতেছেন এইরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। রাজার দুলাল সিদ্ধার্থ যুবতী স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন—ভারতের ইতিহাসে, জগতের ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ঘটনা, ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির উপর ইহা যে কত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার পরিমাপ করা

দুরূহ। উপনিষদের শিক্ষা কতকগুলি বিশিষ্ট সাধনাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, জনসাধারণকে তাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। জনসাধারণ ধর্ম্মের বহিরঙ্গ লইয়া, আচার অনুষ্ঠান লইয়াই গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন করিত। এই জীবনে যে প্রকৃত সুখ শান্তি নাই, রূপ, যৌবন, রাজার ঐশ্বর্য্য কিছুই যে মানুষকে প্রকৃত তৃপ্তি দিতে পারে না, সে তৃপ্তির জন্য সকল বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হইতে হইবে, নিজের অন্তরের মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে—আধ্যাত্মিকতার এই মূল কথাটিই বুদ্ধ নিজ দিব্য ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই দৃষ্টান্তের একটি বিপদ ছিল। আধ্যাত্মিকতা চাই-ই, কিন্তু তাহাই সব নহে, তাহাকে ভিত্তি করিয়া বাহিরের জীবনকেও অধ্যাত্মভাবাপন্ন করিতে হইবে, এই দুঃখময় পৃথিবীতেই আনন্দের, শান্তির, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—এইটিই হইতেছে মানব জীবনের, পার্থিব জীবনের পূর্ণ আদর্শ, বেদে এই আদর্শই সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজপুত্রেরা সন্ন্যাসী হইতে আরম্ভ করিলে সংসার রক্ষা কে করিবে? আমরা দেখিতে পাই গীতা এই বিপদটি পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিয়াছে, এবং লোক যাহাতে আধ্যাত্মিকতা লাভের আশায় সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকিয়া সমাজ-জীবনকে বিপর্য্যস্ত না করে সেই জন্যই অর্জ্জুনের সমস্যাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। যেমন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জন্ম-মৃত্যু-জরা দেখিয়া সংসারের দুঃখময় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যৌবনেই সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনও সেইরূপ কুরুক্ষেত্রের ভীষণ রূপ দেখিয়া কর্ম্মত্যাগ, সংসারত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে, আবার শেষ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুন বিভিন্ন ভাবে এই একই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—সন্ন্যাস বড় না কর্ম্মযোগ বড়? অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগই অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন, সংসারে থাকিয়াই সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে বলিয়াছিলেন। অর্জ্জুন অক্ষম বলিয়া, অযোগ্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই পন্থা দেখাইয়াছিলেন, শঙ্কর প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, "তুমি আমার অতিশয় প্রিয় তাই আমি তোমাকে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান দিলাম, এখন আমার যে সর্ব্বগুহ্য বাক্য তাহা শ্রবণ কর" (১৮।৬৩, ৬৪)। ভগবানের যে অতিশয় প্রিয়, ভগবান

যাঁহাকে সখা বলিয়া বরণ করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা যোগ্য অধিকারী ব্যক্তি আর কে হইতে পারে ?

উপনিষদের বাণী,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

—মুণ্ডকোপনিষদ ৩।২।৩

"বিচার বা ধীশক্তির দ্বারা বা বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, ভগবান নিজে যাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন কেবল তিনিই ভগবানকে লাভ করেন, তাঁহার নিকট আত্মা নিজ স্বরূপে প্রকটিত হয়।" অতএব, অর্জ্জুনকে অযোগ্য পাত্র বলিয়া, জ্ঞানের অনধিকারী বলিয়া সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার চেষ্টা বৃথা। বস্তুতঃ যাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে চান, সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ করিতে চান, এবং অনির্ব্বচনীয় পরম সত্তার শুদ্ধ নীরব নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে সকল ব্যষ্টিগত জীবনের লয় বা নির্ব্বাণ করাকেই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া অনুসরণ করেন তাঁহাদের প্রতি গীতার সুস্পষ্ট বাণী হইতেছে এই যে, এইটিও একটি পন্থা কিন্তু এইটি হইতেছে দুষ্করতম পন্থা, (৫।৬, ১২ ৫), আর উপদেশের দ্বারা অথবা দৃষ্টান্তের দ্বারা কর্ম্মত্যাগের আদর্শ জগতের সম্মুখে ধরা হইতেছে অতিশয় বিপজ্জনক (৩।২০-২৬)। এই পন্থা মহান হইলেও, মানুষের পক্ষে এইটিই শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে (৫।২), আর এই জ্ঞান সত্য হইলেও ইহা পূর্ণ সমগ্র জ্ঞান নহে। পরব্রহ্ম কেবল এক সুদূরবর্ত্তী অনির্ব্বচনীয় অধ্যাত্ম সত্তাই নহেন তিনি এইখানে, এই বিশ্বের মধ্যেও রহিয়াছেন, দেব ও মানবের ভিতর দিয়া, সংসারে যত জীব আছে, যাহা কিছু আছে সবের ভিতর দিয়া তিনি নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহাকে শুধুই নিশ্চল নীরবতার মধ্যেই নহে, পরন্তু এই জগতের মধ্যে, জগতের সকল জীব, সকল আত্মা, সকল প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে পাইতে হইবে, হৃদয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ সব কিছুর ক্রিয়াকে তাঁহার সহিত পরমতম সমগ্রতম যোগে যুক্ত করিয়াই মানুষ অন্তর্জীবনের সমস্যা এবং বাহিরে কর্ম্মময় মানব জীবনের সমস্যার সমাধান একই সঙ্গে করিতে পারিবে। ভগবানের সাধর্ম্ম্য, ভগবানের ভাব লাভ করিয়া সে যে পরমতম অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে উঠিবে তাহা যেমন জ্ঞান ও ভক্তির ভিতর দিয়া তেমনিই কর্ম্মে

ভিতর দিয়াও লাভ করিতে হইবে। অমৃতত্ব ও মুক্তি লাভ করিয়া, সেই উচ্চতম ভূমি হইতে সে তাহার মানবীয় কর্ম্ম করিতে পারে এবং সেইটিকে পরমতম সর্ব্বতোমুখী দিব্য কর্ম্মে রূপান্তরিত করিতে পারে, বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে সকল কর্ম্ম, জীবন ও ত্যাগের, সংসারের সকল প্রচেষ্টার চরম পরিণতি ও সার্থকতা।

গীতা যে দিব্য জীবন, দিব্য কর্ম্মের আদর্শ মানবের সম্মুখে ধরিয়াছে তাহার ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মচৈতন্য, ব্রাহ্মীস্থিতি। সাধারণ জীবনে মানুষ রাজসিক প্রেরণায় যে ভাবে কর্ম্ম করে, জীবন যাপন করে, তাহার উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, সাত্ত্বিক, নৈতিক, ধার্ম্মিক জীবনেরও উর্দ্ধে উঠিতে হইবে—এই জন্য গীতা আত্মজ্ঞান ও অন্তর্মুখীনতার উপর খুবই জোর দিয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে এবং সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই দিকটিতে এত বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে যে মনে হইতে পারে গীতা বুঝি নীরব নিষ্ক্রিয় সত্তায় আত্ম-নির্ব্বাণেরই শিক্ষা দিতেছে, এমন কি এখানে গীতা "নির্ব্বাণ" কথাটিই পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছে। তবে এখানেও গীতা যে-সব ইঙ্গিত দিয়াছে তাহা হইতেই গীতার পূর্ণতর আদর্শটি বেশ বুঝা যায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে এবং পরে শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক তীব্রভাবে সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচারের ফলে গীতার এই আর্দর্শটি ভারতবাসী আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই—ভারতের আধ্যাত্মিকতা উত্তরোত্তর সন্ন্যাসের দিকেই ঝুঁকিয়াছে, গীতা ইহাতে যে বিপদের আশঙ্কা করিযাছিল ভারতের ইতিহাসে তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। বুদ্ধের তিরোধানের অল্পকাল পরেই ভারতের পরাধীনতার ইতিহাস আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০ অব্দে পারসীকগণ ভারত আক্রমণ করিয়া উত্তর-পশ্চিম অংশে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করে। খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজান্দার; ভারত জয় করেন। পরে চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিভা এবং কর্ম্মশক্তি লইয়া ভারতে গ্রীক বিজয়ের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত করিয়া দেন এবং বিরাট ভারত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার পৌত্র অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর ঐ সাম্রাজ্য আবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, ব্যাক্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ স্বাধীন হইয়া যায়। তাহার পর আবার হিন্দুদের রাজত্ব আরম্ভ হয়—গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলেন, এমন অজস্রভাবে দান করিতে

লাগিলেন যে রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া যাইতে লাগিল—এমন কি তিনি তাঁহার নিজ পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত দান করিয়া ভিখারী সাজিতেন। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া ইহার যত মূল্যই থাকুক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার ফল বিষময় হইয়াছিল। ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। তাহার অল্পকাল পরেই মহম্মদ বিন কাশিমের অধীনে ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয়। সেই সন্ধিক্ষণে ভারতে যদি চন্দ্রগুপ্তের মত রাজা, চাণক্যের মত মন্ত্রীর আবির্ভাব হইত তাহা হইলে গ্রীক আক্রমণের ন্যায় মুসলমান আক্রমণেরও সমস্ত চিহ্ন ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত, ভারত স্বাধীনভাবে নিজ সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ করিতে পারিত। কিন্তু ভারতের ভাগ্যলিপি অন্যরূপ। ভারতে রাজনীতি বা সমাজনীতির ক্ষেত্রে কোন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হইল না—ভারতে পুনঃ পুনঃ মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াছে কেবল আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে। ভারতের সেই যুগসন্ধিক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইল, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রতিবোধ করিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ন্যাসের দিকে ঝোঁকটিকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিলেন। ভারতবাসীর জীবনে যে দুইজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন সেই বুদ্ধ ও শঙ্কর দুইজনেই সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, ফলে ভারতবাসী আধ্যাত্মিকতায় খুবই অগ্রসর হইলেও ঐহিক জীবনে তাহাদের চূড়ান্ত পতন হইয়াছে।

গীতা এই বিপদ আশঙ্কা করিয়াই একটা গভীর সমন্বয়ের প্রয়াস করিয়াছিল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেন গীতার এই শিক্ষা জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বুদ্ধ যে অহিংসা ও শান্তির আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে গীতার শিক্ষা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। তবে অন্যপক্ষে দেখা যায় বৌদ্ধধর্ম্মও অনেকখানি গীতার শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।* শান্ত নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম যে সেবাধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল তাহা গীতার শিক্ষারই ফল বলিয়া মনে হয়। মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থে গীতার অনেক শ্লোক শব্দশঃ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীদের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত এই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মও ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

---

* তৃতীয় অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হইলেও বুদ্ধের প্রভাব ভারতে বিলুপ্ত হয় নাই। হিন্দুগণ বুদ্ধকে এক অবতার বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছিল। আর শঙ্করাচার্য্য ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধগণের ন্যায়ই মঠ স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক সন্ন্যাস-আদর্শ প্রচারে ভারতের তত ক্ষতি হয় নাই, কারণ তখনও ভারতবাসীর প্রাণশক্তি সজীব ছিল, তাই ভারতবাসী সন্ন্যাস-ধর্ম্মকেও সেবাধর্ম্মে পরিণত করিতে পারিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই কালিদাসের যুগে লোকে সন্ন্যাসকে আদর্শ হিসাবে খুবই উচ্চস্থান দিলেও, সংসারের ভোগ সুখকে তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করে নাই, সংসারের কর্ম্মকে অবহেলা করে নাই। ইহার মধ্যেও গীতার শিক্ষারই প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। কালিদাসের যুগে আমরা দেখি, সন্ন্যাসের ত্যাগ ও কঠোরতা যেন পিছনে সরিয়া গিয়াছে, সম্মুখে আসিয়াছে জীবনকে সর্ব্বতোভাবে বিকাশ ও ভোগ করিবার আদর্শ। এই যুগে ভারতের কর্ম্মশক্তি যেন শতধারে উথলিয়া উঠিয়াছিল—দর্শন, বিজ্ঞান, চৌষট্টি কলা, ব্যবসা, বাণিজ্য, ভারতের বাহিরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন, বৃহৎ রাজ্য ও সাম্রাজ্য গঠন, জীবনের সকল ক্ষেত্রকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিস্তারিত শাস্ত্র রচনা, যাহা কিছু সুন্দর, মনোরম, সুখপ্রদ সে সবকেই পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার প্রয়াস—এইটিই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গৌরবময় যুগ। কালিদাসের কাব্যগুলিতে আমরা এই যুগের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। কালিদাস ভোগের চূড়ান্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পিছনে ছিল ত্যাগ, সংযম, তপস্যা, আধ্যাত্মিকতার আদর্শ—এবং এই যে ত্যাগের সঙ্গে ভোগ, আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবন—এইটিই ভারতের সনাতন আদর্শ। কালিদাসের কাব্যে আমরা দেখিতে পাই, দেবতারা মানব-রাজার সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন, অপ্সরারা মানবের সহিত প্রেম করিতেছে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন হইতেছে। পৃথিবীতে সমৃদ্ধিশালী জীবন ও ভোগের ইহা অপেক্ষা বড় কল্পনা আর কি হইতে পারে? জার্ম্মানীর মহাকবি গ্যেটে (Goethe) বলিয়াছেন, "যদি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন দেখিতে চাও, তাহা হইলে কালিদাসের 'শকুন্তলা' পাঠ কর।"

ইহার পরেই ভারতের প্রকৃত পতন আরম্ভ হয়। যেমন ব্যক্তির জীবনে তেমনি জাতির জীবনেও জরা ও বার্দ্ধক্য আসে; সহস্র সহস্র বৎসর জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব কর্ম্ম শক্তির ও সৃষ্টি শক্তির পরিচয় দিয়া এই সময়েই

ভারতের জীবনী শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারত চিরকালই আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মে মগ্ন থাকিয়া বাহ্য জীবনকে অবহেলা করিয়াছে—এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা যেমন রামায়ণ মহাভারত হইতে তেমনিই কালিদাসের যুগের অজস্র সাহিত্য হইতে নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হয়। ভারতীয় সভ্যতা চিরকালই অধ্যাত্মভাবাপন্ন; আধ্যাত্মিকতাকেই তাহা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সে বাস্তব জীবনকে, ঐহিক জীবনকে অবহেলা করে নাই, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় দুই হাত ভরিয়া পার্থিব ভোগ ঐশ্বর্য্য এবং অধ্যাত্ম সম্পদ, উভয়মেব, গ্রহণ করিয়াছে। বৈদিক বর্ণাশ্রম আদর্শ ছিল—গার্হস্থ্য জীবনের শেষে সন্ন্যাস আশ্রম। প্রথমে বুদ্ধই এই আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেন, সন্ন্যাসকেই প্রাধান্য দেন—কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যত দিন ভারতের প্রাণশক্তি সতেজ ছিল ততদিন এই আদর্শ বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই, আর গীতার শিক্ষাও ইহার অনেক খানি প্রতিরোধ করিয়াছিল। তথাপি বৌদ্ধ সন্ন্যাসের আদর্শ ভিতরে ভিতরে জাতির মধ্যে কাজ করিতে ছিল—যখন কালবশে ভারতীয় জাতির মধ্যে জড়তা ও অবসাদ আসিল, তামসিকতার প্রভাব হইল, তখন কর্ম্মত্যাগ, সংসারত্যাগ, সন্ন্যাসের দিকে ভারতবাসী বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে হইল আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাব। তিনি নিজের মতানুযায়ী উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা করিয়া সন্ন্যাস ও মায়াবাদকে ভারতীয় মনের মধ্যে বদ্ধমূল করিয়া দিলেন। সকল মানুষই যে তাঁহার শিক্ষার ফলে সংসার ত্যাগ করিল তাহা নহে, কিন্তু সংসারে থাকিয়াও তাহারা জীবনে উৎসাহ ও আস্থা হারাইল—এই সংসার মিথ্যা, এখানে কেহ কখনও সুখশান্তি লাভ করিতে পারে না, এই সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন না করিলে কেহ প্রকৃত জ্ঞান, শান্তি, আনন্দ লাভ করিতে পারে না—এই শিক্ষা যাহাদের মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের দ্বারা সাংসারিক জীবনে কতটুকু উন্নতি হইতে পারে? উপনিষদের মধ্যেই ইহার বীজ ছিল, বুদ্ধ তাহার বিকাশ করেন, শঙ্করের মধ্যে তাহা চরম পরিণতি লাভ করে।

কিন্তু সেই উপনিষদের মধ্যেই ইহার প্রতিকার রহিয়াছে। ভারতবাসী আর সব কিছুকে হারাইলেও উপনিষদের অধ্যাত্ম শিক্ষা হারায় নাই—আর যুগে যুগে তাহা ভারতীয় জাতির মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছে। এখন আমাদের

চোখের সম্মুখে আমরা ভারতের এইরূপই এক নব অভ্যুত্থান দেখিতেছি। একদিকে সেই উপনিষদের শিক্ষা এক নূতন আলোকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, অন্য দিকে জীবন্ত কর্ম্মিষ্ঠ ভোগ-পরায়ণ পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসীর ঐহিক জীবনের প্রতি বৈরাগ্যের ভাব দূর হইতেছে। কিন্তু এখনও দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। আধুনিক যুগ হইতেছে পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগ। ভারতের নবজাগরণ ভারতের অন্তর হইতে, ভারতীয় সাধকগণের প্রভাব হইতেই আসিয়াছে সত্য—তথাপি ভারতবাসীর উপর আজিও পাশ্চাত্য প্রভাব খুবই প্রবল। আবার শঙ্করের প্রভাবও বিশেষ ভাবেই রহিয়াছে। পাশ্চাত্য হইতে ভাবতবাসী প্রধানতঃ দুইটি জিনিষ পাইয়াছে—প্রথম, কর্ম্মের প্রেরণা, সাংসারিক জীবনকে, পৃথিবীতে মানব জীবনকে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিবার প্রয়াস। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চিন্তা-ধারার ভিতর দিয়া বুদ্ধ ও শঙ্করেব শিক্ষার পুনরাবির্ভাব। আমাদের দেশের চিন্তানায়কেরা দুইটির মধ্যে কোন রকমে একটা আপোষ করিয়া লইয়াছেন। দার্শনিক চিন্তায় তাঁহারা শঙ্করেব অদ্বৈত বেদান্তের অনুসরণ করেন, কিন্তু সাংসারিক জীবনে তাঁহারা শঙ্করের নৈষ্কর্ম্ম্যের শিক্ষা বর্জ্জন করিয়া পাশ্চাত্য activism বা কর্ম্মশীলতার অনুসরণ করেন।

লোকমান্য তিলকের গীতারহস্যে এই মনোভাবটা বেশ ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শঙ্করের ন্যায়ই মায়াবাদী, তিনি বলিয়াছেন, "এ-পর্য্যন্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের যে মুখ্য সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রীয় রীতিতে তাহাদের যে সংক্ষিপ্ত উপপত্তি বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, পরমেশ্বরের নামরূপাত্মক সমস্ত ব্যক্ত স্বরূপ কেবল মায়িক ও অনিত্য এবং ইহা অপেক্ষা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ, এবং নির্গুণই সগুণরূপে অজ্ঞান ফলে প্রতিভাত হয় ইহা গীতায় বলা হইয়াছে" (গীতা-রহস্য, নবম প্রকরণ—অধ্যাত্ম)। ইহা নিছক শঙ্করের মায়াবাদ। অথচ তিলক কর্ম্ম সম্বন্ধে শঙ্করের গীতাভাষ্য অনুসরণ করেন নাই।*

* "তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে গীতা ও শঙ্করের সম্প্রদায় মধ্যে এই প্রকার সাধারণ মিল থাকিলেও আচার দৃষ্টিতে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা গীতা কর্ম্মযোগকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায়, গীতাধর্ম্ম শঙ্কর সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন হইয়াছে এইরূপ আমার মত।...তত্ত্বজ্ঞান গীতা ও শঙ্করের সম্প্রদায়ের মধ্যে একই প্রকার—অন্য সাম্প্রদায়িক ভাষ্য অপেক্ষা গীতাব শাঙ্কর ভাষ্যের গৌবব যে বেশী হইয়াছে তাহার কারণও এই" (তিলক—গীতা-রহস্য, নবম প্রকরণ)।

তিনি বলিয়াছেন, "জগতের সর্ব্বভূতের মধ্যে একই আত্মাকে উপলব্ধি করা এবং তদনুসারে কার্য্য করাই অধ্যাত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।" কিন্তু জগৎ যদি মিথ্যা হয়, মায়িক হয়, আর সেই আত্মা যদি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত একাত্মতা লাভ করিলে আর কর্ম্মের প্রেরণা কোথা হইতে আসিবে? বস্তুতঃ শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত, শঙ্করের মায়াবাদ স্বীকার করিলে আর কর্ম্মের প্রেরণা থাকে না, যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণই বর্ণাশ্রমানুযায়ী কর্ম্ম, জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সকল কর্ম্মের অবসান। এ-বিষয়ে শঙ্করের শিক্ষার মধ্যে কোনরূপ স্ব-বিরোধ বা contradiction নাই, তাই আমরা দেখিতে পাই তিনি মায়াবাদ প্রচার করিতে ভারতের সর্ব্বত্র মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু লোকসেবার জন্য মিশন স্থাপন করেন নাই। সকল কর্ম্মের মূল হইতেছে প্রকৃতি, এই প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করিতেছে, সকলের মধ্যে কর্ম্ম করিতেছে। এই প্রকৃতি যদি সৎ-অসৎ মায়া হয়, তবে কর্ম্ম কখনই দিব্য কর্ম্ম হইতে পারে না, কর্ম্ম হইলেই তাহা অবিদ্যা অজ্ঞানস্বরূপিনী প্রকৃতিরই কর্ম্ম হইবে—এইজন্য এই মত অনুসারে জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ তাঁহার "গীতার্থ সন্দীপনী"তে এই মতটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন—"কর্ম্মে চিত্তবিক্ষেপ ও সন্ন্যাসে বিক্ষেপ নিবৃত্তি-রূপ ফল দৃষ্ট হওয়ায়, উভয়ই একাধিকারে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসী হইয়া কর্ম্ম করাও সম্ভব নহে; কেন না ত্যাগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যদি কর্ম্মই করিবেন, তবে সন্ন্যাসাশ্রম লওয়াই ব্যর্থ হইল।" বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় বুদ্ধ বলিতেছেন, "যে ভিক্ষু পূর্ণ অর্হৎ অবস্থায় পৌছিয়াছেন তিনি কিছু না করিয়া গণ্ডারের মত বনে বাস করুন" (সুত্তনিপাত)। মনুসংহিতাতেও আমরা পরিব্রজ্যা বা সন্ন্যাসের এইরূপ বর্ণনাই পাই। তাহা হইলে কর্ম্মের যে আধুনিক আদর্শ তাহার সহিত সন্ন্যাসের সামঞ্জস্য কেমন করিয়া হয়?

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও আমরা কতকটা এইরূপ দ্বন্দ্বই দেখিতে পাই—তিনি শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, অথচ তিনি কর্ম্মের উপর আধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শ অনুযায়ী বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আজ ভারতে যে নূতন কর্ম্ম প্রেরণা দেখা দিয়াছে, সর্ব্বত্র জনহিতকর কর্ম্মে লোকে অনুপ্রাণিত হইয়াছে ইহা

অনেকখানি বিবেকানন্দের শিক্ষা ও আদর্শেরই ফল এবং ইহা ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ভারতবাসীর বহু দিনের জড়তা, নিষ্ক্রিয়তা, তামসিকতাকে তিনি তীব্র ভাবে নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বিরাট দেশব্যাপী জগৎব্যাপী কর্ম্মের জন্য নব্য ভারতকে আহ্বান করিয়াছেন, শঙ্করের বেদান্ত মতের মধ্যে তাহার প্রকৃত সমর্থন লাভ করা যায় না। শঙ্করের মতই যদি আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত স্বরূপ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের সহিত তাহার সামঞ্জস্য কিছুতেই হইতে পারে না, হয় কর্ম্মিগণকে আধ্যাত্মিকতা বর্জ্জন করিয়া পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় আধ্যাত্মিকতা-বর্জ্জিত মানব-ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে হইবে, নতুবা তাহাদিগকে কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে, সংসার হইতে সরিয়া গিয়া আধ্যাত্মিকতার উপাসনা করিতে হইবে। গীতা ঠিক এই সমস্যাটি তুলিয়াই তাহার গভীর সমাধান দিয়াছে, সে-সমাধান ছাড়া আর অন্য কোন সমাধানই নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করের অনুসরণ করিয়াই বলিয়াছেন যে, এই জগৎ মূলতঃ মিথ্যা, মায়া, দুঃখময়—ইহার উন্নতি করিবার সকল চেষ্টাই বৃথা—

"Objective society will always be a mixture of good and evil ; objective life will always be followed by its shadow, death and the longer the life, the longer will be the shadow···. Every improvement is coupled with an equal degradation···. If good is increasing so is evil···. The progress of the world means more enjoyment and more misery too···. To have good and no evil is a childish nonsense." (Complete Works, VI, p. 341). "Two ways are left open—one by giving up all hope to take up the world as it is and bear the pangs and pains in the hope of a crumb of happiness now and then. The other, to give up the search for pleasure (in the world), knowing it to be pain in another form and seek for Truth··· present in themselves," (Ibid, p. 341). "The musk deer after vain search for the cause of the scent of the musk, at last will have to find it in himself." (Ibid, p. 341).

কিন্তু জগৎ যদি মূলতঃ মিথ্যাই হয়, ইহার কোন উন্নতি সাধন যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আর এত জনহিতকর অনুষ্ঠান কেন? মিশন কেন?

যত শীঘ্র মানুষ এই সংসারের দুঃখময়তা উপলব্ধি করিতে পারে তাহাদিগকে কেবল সেই পথ দেখাইয়া দেওয়াই কি ঠিক নহে? আর তাহারই বা প্রয়োজন কি? মিথ্যা জগতের মিথ্যা দুঃখ লইয়াই বা এত আন্দোলন কেন? মাথা নাই যদি তবে আর মাথা ব্যথা কিসের?

অথচ স্বামী বিবেকানন্দ জনহিতকর অনুষ্ঠানের উপর, সকল প্রকার কর্ম্মের উপর খুবই জোর দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দুইটি জিনিষ খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম, মানুষ যে এই দুঃখময় তুচ্ছ ভোগের জীবনে আসক্ত হইয়া অশেষ দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতেছে—মানুষের এই আসক্তিকে দূর করিতেই হইবে। শঙ্করের মায়াবাদ হইতেছে এই আসক্তি-রূপ ব্যাধির পরম ঔষধ স্বরূপ, তাই তিনি মায়াবাদের প্রচার করিয়াছিলেন। মায়াবাদের মূলে যে সত্য রহিয়াছে—এই দুঃখদ্বন্দ্বময় সাংসারিক জীবনের পশ্চাতে অচল, অক্ষর আত্মার অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন শান্তি ও নীরবতা যাহার মধ্যে সকল দুঃখ ও বিক্ষোভের চির অবসান হইয়াছে—এই অধ্যাত্ম সত্যটি স্বামী বিবেকানন্দ খুব গভীরভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন—বস্তুতঃ শুধু এইখানেই ছিল বুদ্ধ ও শঙ্করের সহিত তাঁহার ঐক্য। তাঁহার শেষ জীবনে তিনি তাঁহার মহিলা বন্ধু Joeকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই এইটি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে—"Bonds are breaking, love is dying, work becoming tasteless—the glamour is off life. Now only the voice of the Master calling…Yes, I come, Nirvana is before me. I feel it at times, the same infinite ocean of peace, without a ripple, a breath." অর্থাৎ—"সব বন্ধন ছিন্ন হইতেছে, প্রেম ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, কর্ম্ম বিস্বাদ হইয়া উঠিতেছে—জীবনে আর জ্যোতি নাই। এখন শুধু গুরুর ডাক শুনিতেছি,—হাঁ, এবার যাই, নির্ব্বাণ আমার সম্মুখে—মাঝে মাঝে আমি ইহা উপলব্ধি করি—সেই অনন্ত শান্তিসমুদ্র, তাহাতে না আছে তরঙ্গ, না আছে বায়ু।"

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ আর একটি জিনিষকেও খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—সেটি হইতেছে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। তিনি দেখিলেন তমসাচ্ছন্ন ভারত নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে,—তাহাকে বাঁচাইতে হইলে সর্ব্বতোমুখী কর্ম্ম-প্রচেষ্টার প্রয়োজন, ভারতবাসীকে বহুকাল

পরে আবার কর্ম্মের বাণী শুনাইয়া তাহাদের মধ্যে তিনি নূতন জীবনের সঞ্চার করিলেন। শঙ্করের মায়াবাদের সহিত এই সর্ব্বতোমুখী কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সমন্বয় কেমন করিয়া হইবে তাহা দেখাইবার তিনি বিশেষ কোন প্রয়াস করেন নাই—সত্য বলিয়া যাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন নির্ভীকভাবে তাহাই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, মানুষের যুক্তিতর্কে কোথায় কোন্ অসঙ্গতি বাহির হইবে তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। বুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাঁহার নিজের পক্ষেও তাহা সমানভাবেই প্রযুজ্য—"Shankara sometime resorts to sophistry in order to prove that the ideas in the books go to uphold his philosophy. Buddha was more brave and sincere than any teacher. He said, 'Believe no book, Vedas are all humbug. If they agree with me, so much the better for the books." অর্থাৎ "শঙ্কর কখনও কখনও নিজ মত সমর্থন করিতে শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বুদ্ধের ন্যায় এমন নির্ভীক এবং সত্যসন্ধ শিক্ষাদাতা আর কেহই ছিলেন না। বুদ্ধ বলিয়াছেন, "কোন শাস্ত্রেই বিশ্বাস কোরো না; বেদ সব বাজে, আমার মতের সহিত কোথাও যদি তাহাদের মিল হয় সেটা তাহাদেরই লাভ।"

দক্ষিণ ভারতে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিবার সময় একজন শ্রোতা স্বামীজীর (বিবেকানন্দ) কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন—"কিন্তু শঙ্কর ত এমন কথা বলেন নাই।" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন—"না, শঙ্কর বলেন নাই। কিন্তু আমি বিবেকানন্দ, আমি এই কথা বল্‌ছি।"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কাজ প্রকৃষ্টভাবেই করিয়া গিয়াছেন—ধর্ম্মের নামে ভারতবাসী যে-সব গতানুগতিক আচার অনুষ্ঠানকে অজ্ঞ তামসিকতার বশে ধরিয়া রহিয়াছে সে-সবের ব্যর্থতা ঘোষণা করিয়া তিনি ভারতবাসীকে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার বাণী শুনাইয়াছেন। অন্যদিকে মুমূর্ষু ভারতবাসীর মধ্যে তিনি অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি ও উৎসাহ জাগাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে যে এখনও সমন্বয় হয় নাই, সে সমন্বয়ের যে প্রয়োজনীয়তা আছে এখন তাহা ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা * এখন দেখাইয়া

* Dr. Albert Schweitzer, Prof. Heiler, Karl Barth.

দিতেছেন যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা হইতেছে negation of life, উহা জীবনকে অস্বীকার করে, শঙ্করের ভাষায় "বৈনাশিক"—উহার সহিত জীবন ও কর্ম্মের সমন্বয় করিবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বেদান্ত ও বিবেকানন্দকে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। সম্প্রতি একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, "জীবনে যাহারা অকৃতকার্য্য হয় তাহারাই বেদান্তের ভক্ত হয়।" এইসব অধ্যাপকদের প্রভাবে ছাত্র সমাজেও আজকাল নাস্তিকতার ভাব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে—ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে তাহারা জাতীয় উন্নতির বিরোধী বলিয়াই মনে করিতেছে। অতএব ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ আদর্শ ও স্বরূপটি কি, উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার সহিত পূর্ণতম জীবন, বিশালতম কর্ম্মের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের সূত্র কোনখানে তাহা আজ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিতে হইবে, আর গীতার শিক্ষার মধ্যেই সেই সূত্রটি নিহিত রহিয়াছে, গীতা অর্জ্জুনের মুখে পুনঃ পুনঃ ঠিক এই প্রশ্নটি তুলিয়া ইহার চরম সমাধান করিয়াছে।

গীতার সমাধানের এই সূত্রটি রহিয়াছে দুই প্রকৃতির বিভেদের মধ্যে। শঙ্করের মতে অবিদ্যা বা মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার স্বরূপ অজ্ঞান, ইহা সৎ ও অসৎ অতএব অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু শঙ্কর যাহাকে মায়া বলিয়াছেন, গীতায় বস্তুতঃ তাহা হইতেছে অপরা প্রকৃতি, অর্থাৎ প্রকৃতির নীচের রূপ, অসৎ রূপ। ইহা ব্যতীত প্রকৃতির আর একটি রূপ আছে, তাহা সৎ, তাহাই পরা প্রকৃতি, সচ্চিদানন্দময়ী ভাগবত প্রকৃতি। জগৎ মূলতঃ এই পরা প্রকৃতিরই সৃষ্টি, অপরা প্রকৃতি হইতেছে তাহারই এক নিম্নতন mechanical যন্ত্রবৎ প্রক্রিয়া। মানুষের বর্ত্তমান জীবনে এই অপরা প্রকৃতিরই অজ্ঞান খেলা চলিতেছে, ইহাকে রূপান্তরিত করিয়া এখানে পরা প্রকৃতির জ্ঞানের ক্রিয়ার বিকাশ করিলেই মানুষ দিব্য জন্ম লাভ করিবে, তাহার কর্ম্ম দিব্য কর্ম্মে পরিণত হইবে। গীতার এই দুই প্রকৃতির বিভেদের নিগূঢ় তত্ত্বটি শ্রীঅরবিন্দই প্রথম তাঁহার গীতার ব্যাখ্যায় (Essays on the Gita) দেখাইয়া দিয়াছেন। শঙ্কর পরা প্রকৃতিকে প্রকৃতি বলিয়াই স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে প্রকৃতির একই রূপ এবং তাহা হইতেছে অজ্ঞান অবিদ্যা। বস্তুত: গীতাও এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করে নাই। গীতার পদ্ধতিই হইতেছে কোথাও দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া বেশী আলোচনা না করা। পুরুষোত্তম ও পরা প্রকৃতির তত্ত্ব

অবতারণা করিয়া গীতা দেখাইয়াছে, এই জগৎ মিথ্যা নহে, এই সংসার ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই, ইহার মধ্যে থাকিয়াই, ইহৈব, মানুষ সংসারের সকল দুঃখকে জয় করিতে পারে। দার্শনিকতার দিক দিয়া এইটুক ইঙ্গিত মাত্র কবিয়া কেমন করিয়া মানুষ এই আদর্শ অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে পারে গীতা তাহারই কার্য্যকরী পন্থা ও সাধনাটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিতে অগ্রসব হইয়াছে, তাহাই গীতার যোগ। গীতা প্রধানতঃ দার্শনিক গ্রন্থ নহে, ব্রহ্মবিদ্যা নহে, ইহা হইতেছে প্রধানতঃ যোগশাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে। গীতার এই পবা প্রকৃতিকেই রামকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপিনী জগন্মাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে জগন্মাতাকে স্বীকার করেন নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তিনি জগন্মাতাকে স্বীকাব কবেন। শঙ্করের সৎ-অসৎ অবিদ্যারূপিনী মায়া আব গীতার পবা প্রকৃতি বা রামকৃষ্ণেব চিন্ময়ী জগন্মাতা এক নহে। জগন্মাতাকে, ব্রহ্মেবই চিন্ময়ী শক্তিকে স্বীকার করিলে এই জগৎকে আব মিথ্যা বলা যায না। অনন্ত চিৎশক্তি হইতে যাহার উদ্ভব হইয়াছে তাহা কখনই নিরর্থক হইতে পাবে না—এই জগৎ এক নিগূঢ় ভাগবত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, মানুস ও তাহাব জীবন এই ভাগবত কর্ম্মেরই অঙ্গ—অতএব এসবকে মিথ্যা নিরর্থক বলিয়া জগৎ হইতে, জীবন হইতে সরিয়া যাইলে যে জন্য মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে তাহাব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। এই বিষয়ে দার্শনিক তত্ত্বটি এযুগে শ্রীঅরবিন্দই পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন তাঁহার The Life Divine নামক গ্রন্থে; দিব্য যোগসাধনায় তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার মধ্যে বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ তন্ত্র সবেরই সার সমন্বয় দেখিতে পাই। এই দিক দিয়া দেখিলে বুঝা যায় ভারতের যে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের ধারা রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, বামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহারই পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও সিদ্ধিতে। দিব্য দৃষ্টি লইয়া তিনি দেখিয়াছেন,

"Earth-life is not a lapse into the mire of something undivine, vain and miserable, offered by some Power to itself as a spectacle or to the embodied soul as a thing to be suffered and then cast away from it : it is the scene of the evolutionary unfolding of the being which moves towards

the revelation of a supreme spiritual light and power and joy and oneness, but includes in it also the manifold diversity of the self-achieving spirit. There is an all-seeing purpose in the terrestrial creation ; a divine plan is working itself out through its contradictions and perplexities which are a sign of the many-sided achievement towards which are being led the soul's growth and the endeavour of nature." (The Life Divine, Vol. II, pp. 563-64).

ইহার ভাবার্থ, এই পার্থিব জীবন মিথ্যা নহে, অপবিত্র নহে, নিরর্থক নহে, ইহার ভিতর দিয়া ভগবানই নিজেকে বিচিত্রভাবে প্রকট করিতেছেন—ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া ইহা এক পরম অধ্যাত্ম জ্যোতি ও শক্তি এবং আনন্দ ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার পিছনে রহিয়াছে ভগবানের সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদর্শী ইচ্ছাশক্তি—সংসারের সকল দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও সমস্যার ভিতর দিয়া এক সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে—পার্থিব জীবনের দ্বন্দ্ব ও সমস্যার এত বহুলতা হইতেছে মানুষ যে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময় সম্পদময় দিব্য জীবনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহারই পরিচায়ক।

পার্থিব মানবজীবনের মহত্ত্ব ও সার্থকতা সম্বন্ধে এমন কথা এমনভাবে ইতিপূর্ব্বে ভারতের কোন দার্শনিকই বলিতে পারেন নাই। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর জীবন ও কর্ম্মের যে আদর্শ গীতা মানুষের সম্মুখে ধরিয়াছিল, অর্জ্জুনের মত ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও যাহা বুঝা কঠিন হইয়াছিল, এ বিষয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, শত শত বৎসর পরেও আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসী যাহার মর্ম্মটি প্রকৃতভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, শ্রীঅরবিন্দ অপূর্ব্ব যোগশক্তিবলে সেইটিকে সমুজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন, আধুনিক মানুষের মন এসম্বন্ধে যত প্রশ্ন তুলিতে পারে, যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে সে-সবের সম্যক সমাধান করিয়াছেন, এবং মানুষ কার্য্যতঃ যাহাতে জীবনে উহা অনুসরণ করিতে পারে তাহারও সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী ও সাধনা দেখাইয়া দিয়াছেন।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ। সকল প্রকৃত সুখ ও আনন্দের উৎস হইতেছে আত্মা এবং তাহা আমাদের অন্তরের মধ্যেই রহিয়াছে।

অজ্ঞান মানুষ সুখের আশায় বাহ্য বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়, তাই তাহাকে জীবনে অনেক আঘাত পাইতে হয়, অনেক দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। বাহ্য বিষয়ে এই আসক্তি বর্জ্জন করিয়া অন্তর্মুখী হওয়া, অন্তরের মধ্যেই সুখ ও শান্তির সন্ধান করা—ইহাই হইতেছে সকল আধ্যাত্মিকতার মূল কথা এবং গীতা এইটির উপর খুবই জোর দিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি শুধু এই দিকটাই দেখি, গীতার অন্যান্য অংশের সম্যক হিসাব না লই তাহা হইলে মনে হইবে গীতা এইভাবে কর্ম্মত্যাগ, সংসারত্যাগ করিয়া নীরব নিশ্চল আত্মার মধ্যেই সমাধিস্থ হইতে বলিয়াছে। বস্তুতঃ সন্ন্যাসীগণ এই ভাবেই গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের এই ২৪ শ্লোকটির ব্যাখ্যায় মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন—"তিনি অন্তঃসুখঃ অর্থাৎ বহির্বিষয় হইতে যে সুখ জন্মায় তাহা তাঁহার নাই। আত্মাতেই যাঁহার আরাম অর্থাৎ আরমণ বা ক্রীড়া, কিন্তু বহিঃসুখসাধন স্ত্রী-আদি বিষয়ে যাঁহার আরাম নাই তিনিই অন্তরারাম অর্থাৎ সকল প্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তিনি বাহ্যসুখসাধন-বিহীন। কিন্তু যিনি সকল প্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারও ত কোকিলাদির মধুর শব্দ শ্রবণ, মন্দ মলয় পবন স্পর্শন, চন্দ্রোদয়, ময়ুর-নৃত্য প্রভৃতি দর্শন, অতি মধুর শীতল গঙ্গাজল পান এবং কেতকীকুসুমসৌরভ আদির আঘ্রাণ প্রভৃতি গ্রাম্যভাব হইতে যখন সুখোৎপত্তি হয় তখন তিনি যে বাহ্যসুখশূন্য এবং বাহ্যসুখসাধনবিহীন ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 'তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ,'—তাঁহার সুখ যেমন অন্তরেই আছে কিন্তু তাহা বাহ্য বিষয় হইতে উৎপন্ন হয় না সেইরূপ কেবল অন্তরেই অর্থাৎ আত্মাতেই যাঁহার জ্যোতি অর্থাৎ বিজ্ঞান—কিন্তু বহিরিন্দ্রিয় হইতে যাঁহার বিজ্ঞান জন্মে না অর্থাৎ যাঁহার বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারই নাই তিনি অন্তর্জ্যোতিঃ। কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে শব্দাদিবিষয়ক জ্ঞান জন্মে তাহা তাঁহার নাই। ইহার সার মর্ম্ম এই যে, সমাধি অবস্থায় তাঁহার শব্দাদি বিষয়ের প্রতিভাস অর্থাৎ জ্ঞান হয় না, আর ব্যুত্থানদশায় অর্থাৎ সমাধিশূন্য অবস্থায় সেই শব্দাদি বিষয়-সকলের প্রতীতি হইলেও তিনি সেইগুলির মিথ্যাত্ব অবধারণ করেন অর্থাৎ সেইগুলি যে স্বরূপতঃ মিথ্যা তাহা তিনি তৎকালে নিশ্চিত অবগত থাকেন, এই কারণে বহির্বিষয় হইতে তাঁহার সুখ উৎপন্ন হয় না।"

কিন্তু বস্তুতঃ কি গীতা এইভাবে সকল প্রকার বাহ্য সুখভোগ বিলুপ্ত করিবার শিক্ষা দিয়াছে? গীতার অন্যান্য অংশ অবধারণ করিলে কখনই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। গীতা শব্দাদি বিষয়কে কোথাও মিথ্যা বলে নাই, বরং বলিয়াছে যে, সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের যে সারবস্তু তাহা ভগবান নিজেই—রসোঽহমপ্সু। সংসারে যাহা কিছু বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ, উর্জ্জিত বস্তু, যাহা কিছু সুন্দর, মনোহর, সুখপ্রদ সে সবই ভগবানের বিভূতি। অতএব যে ব্যক্তি ভগবানকে চায়, ভগবানের সহিত সমগ্রভাবে যুক্ত হইতে চায়, তাহাকে যেমন অন্তরের মধ্যে তেমনই বাহ্য জগতের সকল বস্তুর মধ্যেও ভগবানকে লাভ করিতে হইবে। কিন্তু আগে অন্তরের মধ্যে ভগবানকে না পাইলে বাহিরের মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, সেই জন্যই গীতা অন্তর্মুখী হইবার উপদেশ দিয়াছে, বাহ্য জগৎ, বাহ্য বিষয়কে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিয়া অন্তরের মধ্যেই লীন সমাধিস্থ হইবার জন্য নহে। বাহ্য বিষয়ে যতক্ষণ অজ্ঞান আসক্তি থাকে, ঐ বস্তুটি আমার চাই-ই এইরূপ তীব্র বাসনা থাকে, আত্মপর ভেদ করিয়া ভোগ্যবস্তু সকলকে একান্তভাবে নিজের অধীন করিবার জন্য আগ্রহ থাকে ততদিন কাম ক্রোধের বেগ অনিবার্য্য এবং কাম ক্রোধ থাকিলে কেহই প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারে না—সেই জন্যই গীতা এখানে বাহ্য বিষয়ে আসক্তি বর্জ্জন করিয়া অন্তর্মুখী হইতে বলিয়াছে, সুখের আশায় বাহ্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবমান না হইয়া আত্মার মধ্যে যে অখণ্ড সুখ ও শান্তি রহিয়াছে তাহারই সন্ধান করিতে বলিয়াছে। আত্মার শান্তি ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইলে আর বাসনা কামনার বেগ থাকিবে না, বাহ্য বস্তুকে ভোগের জন্য ধরিবার আগ্রহ থাকিবে না, পরন্তু তখন যোগী নিজের আত্মার মধ্যে যে আনন্দ পাইবেন বাহ্য বস্তুর মধ্যেও সেই একই আত্মাকে দেখিয়া সেখানেও সেই আত্মানন্দকেই বিচিত্রভাবে লাভ করিবেন—বাহ্য বস্তু হইতে তিনি যে সুখ পাইবেন তাহা সেই বাহ্য বস্তুর জন্য নহে, পরন্তু তাহার মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে তাহারই জন্য। উপনিষদে বলা হইয়াছে—

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ
প্রিয়ো ভবতি।
ন বা অরে জায়ায়াঃ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া
প্রিয়া ভবতি—বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫।

"পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই পতি প্রিয়। জায়ার জন্য জায়া প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই জায়া প্রিয় হয়। সুখস্বরূপ আত্মাই এই সব বিষয়, সমস্তই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, ধ্যাতব্য। আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন, ধ্যান করিলে সমস্ত জ্ঞানই সুবিদিত হয়। যাহার দ্বারা জীব সুখ অনুভব করে, সুখের কামনা করে, তাহার ভিতরেই আত্মা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন।"

উপনিষদের এই ভাষা হইতে আমরা বাহ্য বস্তু ত্যাগের কোন ইঙ্গিত পাই না, পরন্তু সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দেখিয়া সকল বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সেখানে রহিয়াছে। বেদেও আমরা দেখিতে পাই, ভোগমূলক গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রশংসা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে, "পূর্ব্বে যে ঋষিরা ছিলেন, যাহারা দেবতাদের সঙ্গে সত্য বিষয়ে আলাপ করিতেন—তাঁহারা অপত্যের জনক হইয়াছিলেন এবং সে কারণে ব্রতচ্যুত হন নাই।" অথর্ব বেদে দেখিতে পাই পতি পত্নীকে বলিতেছে,

সামাহং ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং।—অথর্ব ১৪।২।৭১

"আমি সামবেদ, তুমি ঋগ্বেদ; আমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী।"

এই যে স্বর্গকে স্বামীর সহিত এবং পৃথিবীকে স্ত্রীর সহিত তুলনা করা, ইহা হইতেই আমরা বৈদিক আদর্শের সুন্দর পরিচয় পাই। এই পার্থিব জীবনকে হীন অশুদ্ধ বৃথা বলিয়া বর্জ্জন করা নহে, পরন্তু স্বর্গের সহিত মিলিত করিয়া স্বর্গের জ্যোতি ও শক্তি ও আনন্দের দ্বারা এই পৃথিবীকেই স্বর্গ করিয়া তোলা, ইহাই ছিল বৈদিক আদর্শ—গীতা এই আদর্শটিই গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করা সহজ নহে, পুরুষ স্ত্রীকে ব্রহ্ম বলিয়া দেখিবে, স্ত্রী পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া দেখিবে, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অনন্ত আত্মাকে দেখিয়া পরস্পরের সহিত মিলনে অনন্ত বৈচিত্র্যময় আত্মানন্দ উপভোগ করিবে—ইহা মুখের কথায় হয় না, এই আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া সহজেই ব্রতচ্যুতি হইতে পারে, সেই জন্যই গীতা আত্মাকে জানিয়া, ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মই হইবার উপর এত জোর দিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে বাহ্য বিষয়ে সকল আসক্তি বর্জ্জন করিয়া, কাম ও ক্রোধকে সম্পূর্ণ ভাবে জয় করিয়া অন্তরের মধ্যেই আত্মানন্দের সন্ধান করিতে বলিয়াছে। গীতা যে সাধনার পথ দেখাইয়াছে তাহার সহিত সন্ন্যাসীদের প্রদর্শিত মার্গের অনেক দূর পর্য্যন্ত

খুবই মিল আছে, এমন কি গীতা বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, তথাপি গীতা কখনও সংসারের জীবন ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাই—নির্ব্বাণের সহিতই সংসারের কাজের সমন্বয় করিয়াছে, এইখানেই গীতার বিশিষ্ট মহত্ত্ব। ঋগ্বেদে ঋষি বলিতেছেন,

যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্। তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ—

—ঋগ্বেদ ১০।৫৮।১০

"তোমার যে-মন এই সারা বিশ্বের মধ্যে সুদূরের পারে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা এই এখানে আবার ফিরিয়ে এনেছি।"

মানবাত্মা নির্ব্বাণের পরম শান্তি উপলব্ধি করিয়া আবার এই সাংসারিক জীবনেই ফিরিয়া আসিবে, সেই শান্ত প্রতিষ্ঠা হইতে সংসারের সকল প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিবে, ইহাই গীতার শিক্ষা।

শঙ্কর "অন্তরারামঃ" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আত্মাতেই যাহার আরাম বা আক্রীড়া তিনিই অন্তরারামঃ। অনেকেই এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এ-ব্যাখ্যা সঙ্গত। আরাম শব্দের অন্য অর্থ হইতেছে বিশ্রাম, বিরাম, স্বাচ্ছন্দ্য এবং এই অর্থও এখানে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যিনি বাহিরের কোন বস্তুতে নহে পরন্তু আত্মাতেই প্রকৃত শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করেন তিনিই অন্তরারাম। অন্তঃসুখ এবং অন্তরারাম এই দুইটি শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছে, যে-ব্যক্তি আত্মাতেই সুখ ও শান্তি লাভ করেন। ইহাদের দ্বারা বুঝায় না যে, তিনি বাহ্য বস্তু বর্জ্জন করেন, বাহিরে আর তাঁহার কোন ক্রীড়া বা কর্ম্ম থাকে না—পরন্তু আত্মাই হয় তাঁহার সুখ ও শান্তির ভিত্তি, সেই অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা হইতে তিনি সংসারের সকল কর্ম্ম করেন, সংসারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যেই সেই এক আত্মাকে দেখিয়া সর্ব্বত্রই পরম আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করেন। গীতার এই কয়টী শ্লোকের সহিত মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম কয়টি শ্লোকের বেশ মিল আছে। সেখানে বলা হইয়াছে,

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥

মুণ্ডকোপনিষদ ৩।১।৪

"যিনি আত্মাতে ক্রীড়া করিয়া সকল কর্ম্ম করেন (ক্রিয়াবান), আত্মাতেই যাঁহার সকল সুখ ও আনন্দ, তিনিই হইতেছেন ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" অতএব এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে-ব্যক্তি সকল বাহ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ

করিয়া আত্মানন্দে মগ্ন থাকেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্ হইলেও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ নহেন, ব্রহ্মকে তিনি সমগ্রভাবে জানেন না ইহাই উপনিষদের অভিমত এবং এইটি গীতারও অভিমত। গীতা পরের শ্লোকেই এইরূপ যোগী সম্বন্ধে বলিয়াছে যে তিনি সর্ব্বভূতের হিত-সাধনে রত থাকেন।

তথাঽন্তর্জ্যোতিরেব যঃ। শঙ্কর বলিয়াছেন, আত্মাই যাঁহার জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশ তিনি অন্তর্জ্যোতি। শ্রীধর স্বামী ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আত্মাতে যাঁহার দৃষ্টি, বাহিরের নৃত্য গীতাদিতে নহে, তিনিই অন্তর্জ্যোতি। মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যিনি সমাধিস্থ, বহিরিন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপারই যাঁহার নাই, যিনি সমাহিত হইয়া মনকে বাহ্য জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতেই স্থাপন করিয়াছেন তিনিই অন্তর্জ্যোতি। কিন্তু আত্মা যেমন ভিতরে রহিয়াছে, তেমনিই সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতের মধ্যেও রহিয়াছে,* তাহা হইলে যাহার নিকট আত্ম-জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার পক্ষে বহির্জগৎ বিলুপ্ত হইবে কেন? বস্তুতঃ অন্তর্জ্যোতি হইতেছেন তিনি যাঁহার সকল জ্ঞান আত্মা হইতেই উৎসারিত হয়। আত্মা স্বয়ংজ্যোতি, স্বয়ম্প্রকাশ, উপনিষদে যেমন বলা হইয়াছে,

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥

—মুণ্ডকোপনিষদ, ৩।১।৫

"জ্যোতির্ময় শুভ্র (সমুজ্জ্বল) সেই আত্মাকে দোষহীন যতিগণ এখানে এই শরীরের মধ্যেই দর্শন করেন।" চক্ষুকর্ণাদি দ্বারা যে জ্ঞান বাহির হইতে লাভ করা যায় তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহা প্রকৃত জ্ঞানের আভাস মাত্র, অপূর্ণ, অজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত। প্রকৃত জ্ঞান রহিয়াছে আমাদের অন্তরে, আত্মার মধ্যে—আমাদের চিত্তের মলিনতার দ্বারা তাহা আবৃত হইয়া রহিয়াছে (৫।১৫)। অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার সহিত যোগ অভ্যাস করিলে স্বয়ংজ্যোতি আত্মা আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রকাশিত হয়,

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। (৪।৩৮)

সুখের জন্য, শান্তির জন্য, জ্ঞান ও আলোকের জন্য কোন বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভর না করিয়া যিনি অন্তর্মুখী হন, আত্মার সহিত যোগ সাধনা করেন তিনি

* প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি—মুণ্ডক, ৩।১।৪—বিদ্বান পুরুষ সর্ব্বভূতের মধ্যে যে আত্মার জ্যোতি দর্শন করেন।

যথাকালে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ-রূপ সমুচ্চ অধ্যাত্ম অবস্থা প্রাপ্ত হন,—ইহাই এই শ্লোকে গীতার বক্তব্য। আধ্যাত্মিকতা বা অধ্যাত্ম জীবন কি সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে স্পষ্ট ধারণা নাই। যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করা, শাস্ত্রানুযায়ী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা, সামাজিক কর্ত্তব্যসকল পালন করা, পূজা উপাসনা করা—এই সবকেই লোকে সমুচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শ বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ-সবই হইতেছে মানসিক চৈতন্যের জিনিষ। মানুষ যতক্ষণ এই চৈতন্যের মধ্যে বাস করে, ততক্ষণ তাহাকে এই সব বিধি নিষেধ অনুসরণ করিয়াই চলিতে হয়, কিন্তু ইহা হইতেছে অজ্ঞানের জীবন, প্রকৃত সুখ ও শান্তি ও জ্ঞান ইহার মধ্যে নাই, যদিও এই সবের দ্বারাই ক্রমশঃ মানুষ অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু সেই জীবন লাভ করিতে হইলে মানুষকে এই বাহ্য মানসিক চৈতন্যের উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, আমাদের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে তাহার জ্যোতিতে, আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, এবং সে জন্য অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার সহিত যোগাভ্যাস করিতে হইবে।

গীতা এইরূপে অন্তর্মুখী হইবার উপর এখানে বিশেষ জোর দিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে যে, গীতা বুঝি বাহ্য কর্ম্ম ও সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার উপদেশ দিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ এইটিই যে গীতার আদর্শ নহে, এই পঞ্চম অধ্যায়ের মধ্যেই গীতা তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছে।

স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং। অন্তরেই যাহার সুখ ও শান্তি, অন্তরেই যাহার জ্ঞান ও আলোক, সেই যোগীপুরুষ ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন। এখানে যোগী শব্দে কেহ বুঝিয়াছেন কর্ম্মযোগী, কেহ বুঝিয়াছেন সাংখ্যযোগী, আবার কেহ বুঝিয়াছেন বাহ্যসংজ্ঞাহীন সমাধিস্থ পুরুষ যাহার নিকট বাহ্য জগৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যযোগী ও কর্ম্মযোগী এরূপ প্রভেদ যাহারা করে গীতা তাহাদিগকে জ্ঞানহীন বালকের সহিত তুলনা করিয়াছে। গীতার মতে যোগ শব্দের অর্থ হইতেছে ভগবানের সহিত মানবাত্মার যোগ ; কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি সবের ভিতর দিয়াই এই যোগের সাধনা করিতে হয় এবং এই তিনের সমন্বয়েই ভগবানের সহিত পূর্ণতম যোগ সাধিত হয়। মানবাত্মা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে, ইহাই গীতার বক্তব্য, এবং ইহা বেদ ও উপনিষদের বাণী (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০ ; মুণ্ডক ৩।১।১,২)।

এই অমৃতত্বের ভিত্তি হইতেছে নির্ব্বাণ। গীতা নির্ব্বাণ বলিতে সর্ব্বসত্তার বিলোপ অথবা বাহ্য জগৎ-চৈতন্যের বিলোপ বুঝে নাই,—ইহা সুস্পষ্ট। গীতার মতে নির্ব্বাণের অর্থ হইতেছে ব্রহ্মে অর্থাৎ নীরব নিশ্চল নির্ব্ব্যক্তিক অক্ষর আত্মায় ক্ষুদ্র অহং-ভাবের নির্ব্বাণ।

ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি। বাহ্য বিষয়ে সকল প্রকার আসক্তি ও বাসনা সম্পূর্ণ ভাবে বর্জ্জন করিয়া আমাদের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত সর্ব্বদা যোগ অভ্যাস করিলে আমরা সেই আত্মাকেই আমাদের মূল সত্তা বলিয়া অনুভব করি, আমরা সেই আত্মাই হইয়া উঠি, ইহাই ব্রহ্মভূত শব্দের অর্থ, এই ভাবেই আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপ হয়—এবং ইহাকেই গীতা ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—গীতা বলিতেছে আমরা ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করি, অতএব আমাদের সত্তার বিলোপ হয় না, কেবল ব্রহ্মের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের বিলয় হয়। ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে ব্রহ্ম হইতে হয়, ইহা উপনিষদেরও কথা,

ব্রহ্মৈব সন ব্রহ্মাপ্যেতি—বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।৬

ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ আমরা যে আমাদের মূল সত্তায় ব্রহ্মের সহিত এক ইহাই উপলব্ধি করা, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। বেদান্ত দর্শনেও বলা হইয়াছে, অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২২)—"কাশকৃৎস্ন আচার্য্য বলেন পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত।" কিন্তু এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে, গীতা কোথাও বলে নাই যে, মানবাত্মা ভগবান হয়, পুরুষোত্তম হয়—গীতার বক্তব্য এই যে, জীব ব্রহ্ম হইয়া পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করে, নিবসিষ্যসি ময্যেব। গীতা বলিয়াছে, জীব পুরুষোত্তমেরই অংশ, মুক্তি লাভে সে সজ্ঞানে পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করে, মূল সত্তায় সে পুরুষোত্তমের সহিত একত্ব উপলব্ধি করে, অথচ সেই একত্বের মধ্যেই পুরুষোত্তমের সহিত চিরকাল তাহার একটা ভেদ থাকে, জীবের জীবত্ব বা ব্যষ্টি- কখনই লোপ পায় না, মমৈবাংশো সনাতনঃ। অতএব বৌদ্ধরা যে বলেন, সর্ব্বসত্তার বিলোপ সাধনই মানুষের পরম গতি, অথবা অন্য বৈদান্তিকেরা যে বলেন, ব্রহ্মের মধ্যে সকল ব্যষ্টিগত সত্তা বা জীবত্বের বিলোপ সাধনই মানব-জীবনের চরমলক্ষ্য, 'পূজান্তে প্রতিমা নিরঞ্জনের মত

জীবত্বের সেথা নিরঞ্জন। ইহাই চরম গতি, ইহাই মহামুক্তি, কর্ম্মময় জীব-জীবনের ইহাই শেষ সীমা' (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী)—গীতা কোথাও এই আদর্শ শিক্ষা দেয় নাই। আমরা যে অজ্ঞানের বশে আমাদের অহংকেই আমাদের প্রকৃত ব্যষ্টি সত্তা বলিয়া মনে করি, ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া, সর্ব্বভূতের এক আত্মাকেই আমাদের আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করিয়া এই অজ্ঞান অহংভাবকেই ধ্বংস করিতে হইবে—ইহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণ। তখন আমরা মূলতঃ ভগবানের সহিত এক হইয়াও, কর্ম্মজীবনে তাঁহার অংশরূপে তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিব, ব্রহ্মভূতঃ মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ (১৮।৫৪)।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫

অন্বয়—ক্ষীণকল্মষাঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে।

অনুবাদ—যাঁহাদের পাপের কালিমা মুছিয়া গিয়াছে এবং সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, যাঁহারা আত্মজয়ী এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধনে রত, সেইরূপ ঋষিগণ ব্রহ্মে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণম্। নির্ব্বাণতত্ত্ব হইতেছে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনের বৈশিষ্ট্য, বৌদ্ধগণের মতে নির্ব্বাণই হইতেছে মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। গীতাও বলিয়াছে যোগী পুরুষ ব্রহ্ম হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। তাহা হইলে গীতা কি বৌদ্ধদের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছে? নতুবা পুনঃ পুনঃ এই "নির্ব্বাণ" শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য্য কি?

গীতার কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাকারই এই প্রশ্নটির আলোচনা করেন নাই, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত গীতার যে কোন সম্বন্ধ বা সংস্পর্শ থাকিতে পারে একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে চান নাই, বৌদ্ধ ধর্ম্মকে তাঁহারা এক প্রকার "অস্পৃশ্য" করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে, গীতার উদার সমন্বয়মূলক শিক্ষায়

বুদ্ধের শিক্ষা অবহেলিত হয় নাই। যেমন অন্যান্য দর্শন ও সাধন-প্রণালীর মধ্যে তেমনই বৌদ্ধ সাধনার মধ্যেও যে সার সত্য আছে গীতা তাহা দেখাইয়া দিয়াছে এবং নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম্ম কি তাহা বুঝাইয়া দিয়াছে।

ইহার প্রয়োজন ছিল। কারণ বুদ্ধ নিজে নির্ব্বাণের কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। নির্ব্বাণের স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এবং সে-চেষ্টা করায় কোন লাভই নাই,—কেমন করিয়া মানুষ নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে তাহা দেখাইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। বুদ্ধ নিজেই ছিলেন নির্ব্বাণের জীবন্ত আদর্শ—গীতা যে নিষ্পাপ সংশয়হীন আত্মজয়ী সর্ব্বভূতহিতে রত ঋষির নির্ব্বাণ-লাভের কথা বলিয়াছে বুদ্ধ নিজেই ছিলেন সেইরূপ ঋষি—তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়াই লোকে নির্ব্বাণের স্বরূপ উপলব্ধি করিত—মুখের কথায় তাহার ব্যাখ্যা করার আবশ্যক হইত না। বস্তুতঃ এই সব অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ভাষায় ঠিক মত প্রকাশ করা যায় না, তর্কবুদ্ধির দ্বারা সে-সব ঠিক মত গ্রহণও করা যায় না। বুদ্ধ বা খৃষ্ট বা মহম্মদ জীবনে কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বা কি উপদেশ দিয়াছিলেন—সে-সবই হইতেছে বাহ্য জিনিষ, সে-সব হইতে তাঁদের ঠিক পরিচয় মিলেনা—যদিও বহির্মুখী বুদ্ধি এই সব বাহ্য জিনিষ দিয়াই অবতার বা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝিতে চায়, স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং? বস্তুতঃ তাঁহারা কি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কি অধ্যাত্ম সত্য প্রকট হইয়াছিল, নিজেরা কি হইয়া পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে কি হওয়া তাঁহারা সম্ভব করিয়াছিলেন, কোন্ অভিনব অধ্যাত্ম সিদ্ধির পথ তাঁহারা খুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয়—তাঁহাদের সেই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্মসিদ্ধির যতটুকু ইঙ্গিত তাঁহাদের বাহ্য আচরণ বা উপদেশ হইতে পাওয়া যায় তাহাতেই তাঁহাদের সার্থকতা। তাঁহাদের জীবিতকালে, তাঁহাদের সাক্ষাৎ প্রভাবের সহায়তায় মানুষ তাঁহাদের নিকট হইতে যে সাহায্য পায় পরে আর সেইরূপটি সম্ভব হয় না; তখন তাঁহাদের প্রবচন ও উপদেশাদির উপরেই নির্ভর করিতে হয়, আর সে-সব লইয়া মানুষের বুদ্ধি তর্ক-বিতর্কের দ্বারা নানা গোলমালের সৃষ্টি করে। বুদ্ধের শিক্ষা সম্বন্ধেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই—নির্ব্বাণের স্বরূপ সম্বন্ধে বুদ্ধ নিজে কিছুই বলেন নাই, কিন্তু লঙ্কাবতার-সূত্র নামক বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখি নির্ব্বাণ সম্বন্ধে বিংশতি প্রকার বিভিন্ন মতের সমালোচনা করা হইয়াছে। এই

সব বিভিন্ন মতে ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রভাব বেশই দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ নিজে বেদ, উপনিষদ বা ভারতের কোন দার্শনিক সম্প্রদায়কে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তিনি নিজের সাধনার দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই নিজের ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন—তথাপি সত্য একই, এবং তাঁহার শিক্ষার সহিত ভারতের বেদ ও উপনিষদের শিক্ষার মূলতঃ কোন প্রভেদই নাই একথা বলিলে বুদ্ধের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র খর্ব্ব করা হয় না। অন্যপক্ষে বুদ্ধ প্রকাশ্যভাবে বেদের (প্রামাণিকতা) স্বীকার করেন নাই বলিয়াই যে তাঁহার শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়—এ মনোভাব ঠিক নহে, বস্তুতঃ গীতায় আমরা এরূপ মনোভাবের কোন পরিচয় পাই না। মানব জাতির অধ্যাত্ম ক্রম-বিকাশে বুদ্ধের সাধনা ও সিদ্ধির বিশিষ্ট স্থান আছে, গীতা সেইটিই দেখাইয়া দিয়াছে।

নির্ব্বাণ বলিতে সাধারণতঃ সর্ব্বসত্তার বিনাশ বা লোপ বুঝা হয়। নির্ব্বাণ কথাটিই এইরূপ অর্থের দ্যোতক। বৌদ্ধ শাস্ত্রে অনেক স্থলে নির্ব্বাণের সহিত দীপ নির্ব্বাণের তুলনা করা হইয়াছে। যথা,

'খিণম্ পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবম্,
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিন্,
তে খিণবীজা অবিরুল্‌হচ্ছন্দা,
নিব্বন্তি ধিরা যথায়ম্ পদিপো। —রতন সুত্ত, ১৪।

"পুরাতন ধ্বংস হইল, আর নূতনের উদ্ভব নাই। যাঁহাদের মন ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি বিরক্ত, যে-সব জ্ঞানী ব্যক্তি (জীবনের) বীজকেই বিনষ্ট করিয়াছেন, যাঁহাদের বাসনা আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, তাঁহারা প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হন।" তাহা হইলে নির্ব্বাণের পর কি আর কোন সত্তা বা অস্তিত্বই থাকিবে না? হিন্দু দার্শনিকগণ নির্ব্বাণের এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াই বৌদ্ধগণকে "বৈনাশিক" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। বৌদ্ধগণ এইরূপ সত্তার বিনাশকেই জীবনের চরম পরিণতি বলেন মনে করিয়া অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মকে ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বৌদ্ধগণ ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন,

নাস্তি অহম্ ন ভবিষ্যামি ন মেঽস্তি ন ভবিষ্যতি।
ইতি বালস্য সন্ত্রাসঃ পণ্ডিতানাং ভয়ক্ষয়ঃ ॥*

---

* এই প্রাচীন শ্লোকটি কমল শীল কর্ত্তৃক তত্ত্বসংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে।

—"অহংয়ের কোন অস্তিত্ব নাই, কখনও থাকিবেও না, তেমনই আমার বলিয়া কিছুই নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। এই সত্য অল্পবুদ্ধি বালকদেরই সন্ত্রাস উদ্রেক করে, পরন্তু পণ্ডিতদের পক্ষে ইহা হইতেছে সকল ভয়ের বিনাশক।"

তত্ত্ব-সংগ্রহে (৩৩২২) উদ্ধৃত এই প্রাচীন বৌদ্ধ শ্লোকটি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৌদ্ধগণ অহং বা ব্যক্তিগত বিশিষ্ট সত্তারই অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, ইহাকেই তাঁহারা আত্মা বলিয়া অভিহিত করেন, ইহা ভ্রমাত্মক, ইহাই জন্ম ও জীবনের মূল এবং সেই সঙ্গে সকল দুঃখের মূল—অজ্ঞানের নাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রমাত্মক অহং বা আত্মারও লয় হয় এবং প্রকৃত পক্ষে ইহাই নির্ব্বাণ। কিন্তু তাহার পর থাকে কি? এই প্রশ্নের অনেক রকম উত্তর দেখা যায়, তাহাদিগকে মোটামুটি চারিটিতে পরিণত করা যাইতে পারে। প্রথম, নির্ব্বাণের পর আর কোন কিছুই বিদ্যমান থাকে না। কোন কোন বৌদ্ধ এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তবে সাধারণতঃ বৌদ্ধগণের যে ইহা মত নহে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়, নির্ব্বাণের পর কেবল শুদ্ধ চৈতন্য বর্ত্তমান থাকে তাহাতে অহংভাবের লেশ নাই, কোন ক্লেশ বা দুঃখের অবশেষ নাই। এইটি হইতেছে বিখ্যাত বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদীগণের মত। বসুবন্ধু তাঁহার ত্রিংশিকা নামক গ্রন্থে নির্ব্বাণের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন,

অচিত্তোঽনুপলম্ভোঽসৌ জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তৎ।
আশ্রয়স্য পরাবৃত্তির্দ্বিধা দৌষ্ঠুল্যহানিতঃ॥ ২৯
স এবানাস্রবো ধাতুরচিন্ত্যঃ কুশলো ধ্রুবঃ।
সুখো বিমুক্তিকায়োঽসৌ ধর্ম্মাখ্যোঽয়ং মহামুনেঃ॥ ৩০

এই কারিকা দুইটিতে দেখান হইয়াছে কিরূপে যোগী উত্তরোত্তর নির্ব্বাণ লাভ করেন। সাধারণ মানুষের দুই প্রকার মায়া বা ভ্রান্তি আছে, তাহাদিগকে গ্রাহদ্বয় বলা হয়। বিজ্ঞান বা চৈতন্য হইতে পৃথক অবস্থাতেও গ্রাহ্য-বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব—এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের নাম গ্রাহ্যগ্রাহ। আর বিজ্ঞানের দ্বারাই বাহ্যবস্তু বিজ্ঞাত, প্রতীত ও সমধিগত হইতেছে, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের নাম গ্রাহকগ্রাহ। বসুবন্ধু তাঁহার "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিবিংশতিকা" নামক গ্রন্থের প্রথম কারিকায় বলিয়াছেন "বিজ্ঞান মাত্রই এমন সব বস্তুর

অবভাসনের বিজ্ঞান যাহাদের প্রকৃত অস্তিত্বই নাই; উপমা—চক্ষুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি যেমন যেখানে কেশ নাই সেখানেও কেশ দেখিতে পায় বলিয়া মনে করে, এবং আকাশে দুইটি চন্দ্র উঠিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকে।" অর্থাৎ আমরা যে বাহিরে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী—এই বিরাট বিশ্বপ্রপঞ্চ দেখি, আমাদের চৈতন্যের বাহিরে ইহাদের কোন অস্তিত্বই নাই—এ-সবই হইতেছে আমাদের চৈতন্যেরই ক্রিয়া। পাশ্চাত্য দর্শনে ইহাই Subjective Idealism বলিয়া খ্যাত। শঙ্করের মায়াবাদেরও উৎপত্তি এইখানে; শঙ্করও জগৎকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়াছেন। পূর্ব্বে আর কেহই এইরূপ মত প্রকাশ করে নাই। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ায় ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমতের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে—শঙ্করাচার্য্য এই মতের নিন্দা করিলেও প্রকারান্তরে এইটিই গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্যই শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। এই মায়া বা গ্রাহ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মোক্ষ; বৌদ্ধমতে ইহাই নির্ব্বাণ, বসুবন্ধু এই অবস্থাকেই "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা" নামে অভিহিত করিয়াছেন—কারণ সেখানে আর গ্রাহ্য-গ্রাহক-ভ্রান্তি নাই, তখন যোগী হইয়া পড়েন "অচিত্ত" এবং "অনুপলম্ভ", তখন আর সাধারণ মানস-চৈতন্য বা বাহ্য-জগতের উপলব্ধি থাকে না, যোগী যে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন তাহা পার্থিব জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাহা সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প (undiscriminating) ও "লোকোত্তর" (transcendental)। এ-পর্য্যন্ত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের সহিত শঙ্করের মতের কোন প্রভেদই নাই। বৌদ্ধগণ এই শুদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু কোন চৈতন্যময় বা জ্ঞানময় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। শঙ্করেরও যে ব্রহ্ম তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তিত্বের লেশ নাই—তাহার স্বরূপই জ্ঞান, চৈতন্য—তিনি নির্গুণ নির্ব্যক্তিক। প্রভেদ এই যে, বৌদ্ধগণ এই নির্গুণ, নিরূপাধি জ্ঞানকে ব্রহ্ম-নামে অভিহিত না করিয়া কোথাও নির্ব্বাণ, কোথাও শূন্য আবার কোথাও বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা নামে অভিহিত করিয়াছেন। উপনিষদেও আমরা দেখিতে পাই ব্রহ্মকে প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান, সত্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

কিন্তু এই শুদ্ধ বিজ্ঞান বা চৈতন্যের মধ্যে গ্রাহ বা মায়ার উদ্ভব হইল কেমন করিয়া? এই মায়া হইতেই জগৎপ্রপঞ্চ এবং তাহাই দুঃখের আলয়। সত্যময় ব্রহ্মের মধ্যে এই মিথ্যাময়, সকল দুঃখের আলয় জগৎ কেমন করিয়া আসিল?

এই প্রশ্নটিই হইতেছে সকল দর্শনশাস্ত্রের চরম প্রশ্ন—ইহার উত্তরেই দর্শনে দর্শনে সকল প্রভেদ হইয়াছে, এই প্রশ্নের সুমীমাংসা না হইলে সংসারের এবং মানবজীবনের প্রকৃত রহস্যই উদ্ঘাটিত হয় না। বিজ্ঞানবাদী বলেন মূলে বাস্তব কিছু না থাকিলে মিথ্যা জ্ঞানও সম্ভব হয় না। তাঁহার মতে বাহ্য জগতের কোন অস্তিত্ব নাই বটে, কিন্তু কোন প্রকার বাহ্যবস্তু না থাকিলেও বিজ্ঞান বাহ্যবস্তুর আকার গ্রহণ করে, ইহাই বিজ্ঞানের "পরিণাম" বলিয়া আখ্যাত। কিরূপ কারণ-পরম্পরায় বিজ্ঞানের এই পরিণাম হয়, বৌদ্ধগণ তাহা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন—ইহাই বৌদ্ধগণের বিখ্যাত প্রতীত্য-সমুৎপাদবাদ (পালিপিটকের ভাষায়, পটিচ্চসমুপ্পাদ)।

'প্রতীত্যসমুৎপাদ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হইল "কারণাবলীর সহযোগে উৎপত্তি" (dependent origination)। পালিপিটকের "পটিচ্চসমুপ্পাদ" বস্তুতঃ একটি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করাই ছিল বুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। দুঃখ দূর করিতে হইলে তাহার কারণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং সেই কারণ দূরীভূত করিতে হইলে সেই কারণেরই বা কারণ কি তাহাও জানিতে হইবে। এইভাবে অনেক দার্শনিক প্রশ্ন উত্থিত হয়, কিন্তু বুদ্ধ সে-সব আলোচনা করেন নাই—তিনি বলিয়াছিলেন, দুঃখের কারণ তৃষ্ণা (অর্থাৎ কামনা), এই তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলে দুঃখ আপনা হইতেই দূর হইবে। বেদান্তাদি দর্শন আরও দূরে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই জগতের মূল কারণ। বৌদ্ধগণ এই মত ক্রমশঃ গ্রহণ করিয়াই পটিচ্চসমুপ্পাদের প্রথম রূপের (যেখানে দুঃখোদ্ভবের কারণ-পরম্পরা "তৃষ্ণা"র অধিক আর অগ্রসর হয় নাই) যে বিকাশ করিয়াছিলেন তাহা এই :—অবিদ্যা হইতে জন্মে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (ছয়টি ইন্দ্রিয়), ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ (contact), স্পর্শ হইতে বেদনা (sensation), বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান (আসক্তি), উপাদান হইতে ভব (continued existence), ভব হইতে জন্ম, এবং জন্ম হইতে জরা-মৃত্যু-দুঃখ-শোকাদি। ইহাই পটিচ্চসমুপ্পাদের পরিণত রূপ।

আমাদের পক্ষে এখানে এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই—কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়

কর্ত্তৃকই গৃহীত হইয়াছিল, এবং ইহার বিকাশে বেদান্তাদি দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ এই প্রতীত্য-সমুৎপাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদিগণ দুই প্রকার বিজ্ঞানের কথা বলেন—শুদ্ধ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা এবং আলয়বিজ্ঞান। তাঁহাদের মতে এই আলয়বিজ্ঞান সংস্কারের আশ্রয়, অহংভাবের আশ্রয় এবং সুখদুঃখময় জীবনের কারণ—এই বিজ্ঞান যখন সর্ব্বসংস্কার হইতে মুক্ত হয় তখনই তাহা হয় শুদ্ধ বিজ্ঞান—সে বিজ্ঞানের বিশেষ কোন রূপও নাই, এমন কি গ্রাহ্য (object) ও গ্রাহক (subject) এরূপ ভেদও নাই। কমলশীল স্পষ্টই ইহা বলিয়াছেন—যেষাং তু বিজ্ঞানবাদিনাং মতং সর্ব্বমেব জ্ঞানং গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়মেব প্রকাশতে। ইহা উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি।

উপনিষদে বলা হইয়াছে, একমাত্র চৈতন্যময় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে আমরা এই যে জগৎ এবং জগতে অসংখ্য জীব ও বস্তু দেখিতেছি এ-সবই সেই চৈতন্যেরই রূপ, সেই চৈতন্যের বাহিরে ইহাদের কোনই অস্তিত্ব নাই, থাকিতে পারে না। অতএব বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধ যে বলেন সকল বস্তুই বিজ্ঞানের আকার বিশেষ, বিজ্ঞানের বাহিরে তাহাদের কোন অস্তিত্বই নাই—ইহা কিছুই নূতন কথা নহে, ইহা উপনিষদ বা বেদান্তেরই কথা। এখন প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্মের অনন্ত অসীম শুদ্ধ চৈতন্য এইরূপ দৃশ্য চিৎ অচিৎ বস্তু-সমন্বিত জগৎরূপে পরিণত হইল কেমন করিয়া? বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধ বলেন, এই পরিণতির মূলে রহিয়াছে গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ (Subject-object relation) বিশ্বব্যাপী অবিদ্যা বা মায়া। এই মায়ার বশে বিজ্ঞান নিজেই গ্রাহক ও গ্রাহ্য এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং এই ভাবেই সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়। এখানেও সেই উপনিষদের প্রতিধ্বনি, তদৈক্ষত, তদসৃজত, তৎ সর্ব্বমভবৎ।—তৈত্তিরীয় ২,৬; বৃহদারণ্যক ১।৪।১০

"তিনি দর্শন করিলেন এবং সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, আপনিই সমস্ত হইলেন"।

তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ—বৃহদারণ্যক ১।৪।১০

"পূর্ব্বে ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি আপনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং তাহা হইতে সমস্ত হইলেন।"

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত—তৈত্তিরীয়, ২।৭

"তিনি আপনিই আপনাকে (সর্ব্বরূপে) উৎপাদন করিলেন।"

নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা···বিজ্ঞাতা—বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২৩

"তিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই, তিনি ভিন্ন অন্য বিজ্ঞাতা নাই।"

কিন্তু তিনি কি দেখেন? কি জানেন? তিনি নিজেকেই দেখেন। জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে আপনাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানেন না, তবে আপনি অন্যবৎ হইতে পারেন এবং আপনার সেই হওয়া মূর্ত্তিটি জানিতে পারেন এবং এইরূপ হওয়া বা জানা দ্বারা দর্পণের প্রতিবিম্ব প্রকাশের মত বিষয়ের অস্তিত্ব নিরূপণ করেন। দর্পণের সাহায্যে আমরা যেমন এক হইয়াও দুই হই, নিজেই নিজেকে দেখি—সেইরূপ নিজ চিতিশক্তির দ্বারা ব্রহ্ম নিজেই জগৎ হন। আমরা যখন কোন বস্তুকে জানি, তখন আমাদের বুদ্ধি ঐ বস্তুর আকার গ্রহণ করে, আমরা ঐ আকারকেই জানি। সকল জানার মূলেই এই তাদাত্ম্যভাব রহিয়াছে—কোন বস্তুকে জানিতে হইলে তাহার সহিত এক হইয়াই তাহাকে জানা যায়। আর বদ্ধজীবের বুদ্ধি যদি বিষয়ের আকার গ্রহণ করিতে পারে, তখন মুক্তক্ষেত্রে সে যে স্বাধীনভাবে নানা রূপ গ্রহণ করিবে ইহাতে কোন অন্তরায়ই থাকিতে পারে না। চৈতন্য নিজেকে জানেন—তিনি স্বপ্রকাশ। কূটস্থ অবস্থাতেও তাঁহার এই আত্মবিষয়ক চেতনা থাকে অব্যক্ত ভাবে; সেইটি যখন ব্যক্ত হয়, ব্রহ্ম নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, ব্রহ্মাস্মীতি, তখনই হয় জগৎসৃষ্টির সূত্রপাত, তিনি নিজেকে জানেন এবং তাহা হইতে সবকে জানেন—তাঁহার সর্ব্ব জ্ঞানটি হইতেছে তাঁহার আত্মজ্ঞানেরই বিস্তৃতি, তিনি নিজেকেই সব বলিয়া জানেন। আর ব্রহ্মক্ষেত্রে নিজেকে সব বলিয়া জানার অর্থই সব হওয়া। ইহাই হইতেছে ব্রহ্মের জগৎরূপ আকার গ্রহণ করার মূল রহস্য। "সাক্ষাৎ আত্মা হইতে এইরূপে জগৎপ্রকাশ হয়। পূর্ব্বোক্ত 'অস্মি' আকারীয় মহান্ সত্তা প্রত্যয়ে খণ্ড খণ্ড বিশিষ্টতা রচনা করিয়া, সেই সকল বিশিষ্টতায় জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হন ও নামরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করেন। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ—মন্বানো মনঃ—তিনি কথা কহিয়া বাগিন্দ্রিয় হইলেন, দর্শন করিয়া চক্ষু হইলেন, মনন করিয়া মন হইলেন (বৃহদারণ্যক ১।৪।৭), ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম-বাদের বিশেষত্ব। বস্তুতঃ অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ, সমস্তই জ্ঞানেরই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ও ক্রিয়া-প্রকাশ—এতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি (ঐতরেয় ৫।২)"—অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা, পৃঃ ১২।

অতএব আমরা দেখিতেছি, ইন্দ্রিয়গণ ও বাহ্যবিষয় এ-সবই যে চৈতন্যেরই আকার—নাম ও রূপ, বৌদ্ধগণের এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিরই অনুযায়ী, যদিও তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে ইহা স্বীকার করেন না। শ্রুতির সহিত বৌদ্ধদর্শনের প্রভেদ হইয়াছে কোন্‌খানে এবং কেমন করিয়া সেই প্রভেদ হইয়াছে, এইবারে সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করিব। কারণ ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে এই বিষয়টি হইতেছে খুবই গুরুতর। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্ম নিজেকে জানিলেন, "আমি" বলিয়া অনুভব করিলেন, ব্রহ্মাস্মি—ইহা হইতেই জগতের সূত্রপাত। ইহার পূর্ব্বে তিনি ছিলেন কূটস্থ—"আমি" "আমাকে" জানিতেছি এই আত্মজ্ঞান তাহাতে ব্যক্ত হয় নাই। কিন্তু এই যে আত্মজ্ঞানের অভিব্যক্তি, ইহা কি ব্রহ্মের মধ্যে আপনা হইতেই হইল—না, ইহাতে অন্য কোন বস্তু বা শক্তির প্রভাব আছে? সাংখ্যদর্শনের মত এই যে, পুরুষের যে শুদ্ধ চৈতন্য তাহাতে এই "আমি" ভাবের লেশ নাই—তাহা শুধুই চৈতন্যস্বরূপ, তাহাতে জ্ঞাতা জ্ঞেয়, গ্রাহক গ্রাহ্য এমন কোন বিশেষ বা ভেদ নাই—এই ভেদ উৎপন্ন হয় যখন পুরুষ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে। প্রকৃতি পুরুষ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব। সূর্য্যালোক যখন কোন বিষয়ের উপর পতিত হয়, তখনই তাহা আলোকরূপে প্রকট হয়, তেমনই পুরুষের চৈতন্য যখন জড়প্রকৃতির সম্মুখে আসে তখনই তাহার মধ্যে আত্ম-জ্ঞান, অহং-জ্ঞান প্রকাশিত হয়, বস্তুতঃ এই অহংজ্ঞান, অস্মিতা হইতেছে বুদ্ধির ক্রিয়া, বুদ্ধি প্রকৃতিরই একটি তত্ত্ব, তাহা প্রকৃতির জড় ক্রিয়া, পুরুষের চৈতন্যে তাহা উদ্ভাসিত হইলে পুরুষ নিজকে সেই বুদ্ধির সহিত এক করিয়া দেখে, বুদ্ধির সমস্ত ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলিয়া অনুভব করে—এই ভাবেই হয় পুরুষের সংসার লীলা। মন, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি ধর্ম্ম, পঞ্চভূত—এ সবই বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত, বুদ্ধিরই ক্রিয়া বা বিকার, পুরুষ সেই সবকে নিজেরই ক্রিয়া বলিয়া ভ্রম করে। অতএব পুরুষের চৈতন্য কখনই কোন আকার গ্রহণ করে না, তাহাতে কোন বিকার বা পরিবর্ত্তন নাই, যত পরিবর্ত্তন হইতেছে প্রকৃতিতে—এই প্রকৃতিই জগতের মূল উপাদান, পুরুষ কেবল তাহার দ্রষ্টা, ভোক্তা। এই যে সাংখ্য চৈতন্য হইতে পৃথক আর এক তত্ত্ব—জড় প্রকৃতির অবতারণা করিল, এইখানেই হইল বেদান্ত দর্শনের সহিত ইহার মূল প্রভেদ। সাংখ্য শ্রুতির অনুসরণ করিয়াই এই দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কিন্তু

বেদান্ত দর্শনের মতে উহা হইতেছে শ্রুতির বিকৃত ব্যাখ্যা, শ্রুতি কোথাও ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করে নাই। এখানে আমরা এ প্রশ্নের আলোচনা করিব না—কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাংখ্যদর্শনও অত্যুচ্চ অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সাংখ্য যে পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ করিয়াছে, অধ্যাত্ম সাধনায় ইহার বিশেষ উপযোগিতা আছে এবং গীতাও তাহা স্বীকার করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, সাংখ্য কেন পুরুষের চৈতন্য অপেক্ষা এক দ্বিতীয় তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিল? মানুষের যে সাধারণ চৈতন্য, ইহা হইতেছে মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া, ইহাকে ছাড়াইয়া এক উর্দ্ধতর চৈতন্যের মধ্যে উঠাই হইতেছে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ—যঃ বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ। এই যে বুদ্ধির উর্দ্ধে পুরুষের বা আত্মার চৈতন্য, কোনরকমে একবার ইহার মধ্যে উঠিলে মানুষ তাহার প্রথম অনুভূতিতেই একান্তভাবে নিবিষ্ট হইয়া পড়ে—যে পথ দিয়া সে উপরে উঠে সেই এক দিক দিয়াই সে অগ্রসর হয়, অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে যে নানা দিক, নানা উচ্চতা ও গভীরতা আছে সে-সবই একেবারে অধিগম্য করা সম্ভব হয় না। যদি কেহ ভক্তির পথ ধরিয়া অধ্যাত্মজীবনের দিকে অগ্রসর হয়, সে ভগবানের প্রেমানন্দে এমন ভাবে ডুবিয়া যায় যে, ভাগবত জীবনের যে আরও কত দিক, কত ভাব আছে তাহা উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। শ্রীচৈতন্যের এইরূপই হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দ মঠে' সন্তান সম্প্রদায়ের নায়ক সত্যানন্দের মুখ দিয়া চৈতন্যধর্ম্মের প্রতি বেশ কটাক্ষ করিয়াছেন—

"চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।"

আবার যাঁহারা জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হন তাঁহারা আত্মার নীরব নিষ্ক্রিয় শাশ্বত নির্ব্যক্তিক চৈতন্যের অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের মধ্যেই এমন ভাবে ডুবিয়া যান যে ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে শক্তি আছে, প্রেমও আছে তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। সাংখ্যদর্শন এইরূপই এক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর বৌদ্ধদর্শন ও পরে শঙ্করের মায়াবাদ ঠিক এই অনুভূতিরই

অনুসরণ করিয়াছে। কেবল গীতার মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই সমগ্র অধ্যাত্মভূমির এমন নক্সা দেওয়া হইয়াছে যাহাতে ভাগবত-চৈতন্যের কোন প্রধান দিকই বাদ যায় নাই। সাংখ্য হইতেছে একান্ত জ্ঞানের মার্গ, গীতার ভাষায়—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং। ঊর্দ্ধতর চৈতন্য সম্বন্ধে সাংখ্যের যে অনুভূতি তাহা হইতেছে নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকল্প; আমবা জীবন বলিতে যাহা বুঝি, আমাদের দেহ, প্রাণ, মনের ক্রিয়া—চিন্তা, বেদনা অনুভূতি, ভাবাবেগ, সঙ্কল্প, বিকল্প, ইচ্ছা, দ্বেষ—এ-সবের কোন লেশ পুরুষের চৈতন্যের মধ্যে নাই। অথচ এ-সবই হইতেছে আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য—ইহাদের অস্তিত্ব উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কিন্তু ইহাদের সহিত পুরুষের শুদ্ধ চৈতন্যের কোন সমন্বয়ই হয় না—এই জন্যই সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছে, আর এইরূপ বিভাগ করায় সাংখ্য যে সমাধান চাহিয়াছিল তাহাও মিলিয়াছে। সে সমস্যাটি হইতেছে সংসারের দুঃখের সমস্যা—সাংখ্যের আরম্ভই হইল, দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা। সংসার দুঃখময়, এই দুঃখের ঐকান্তিক উচ্ছেদই মানবজীবনেব লক্ষ্য, পুরুষার্থ। সাংখ্য দেখিয়াছে, পুরুষের চৈতন্যে দুঃখের লেশ নাই, সেই চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে সকল দুঃখ ও অশান্তির চির-অবসান হয়। আর পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা—এই জ্ঞানের পরিপুষ্টি হইতেই ঐ শান্তি ও মুক্তি লাভ করা যায়, পুরুষ আর নিজেকে প্রকৃতির সহিত এক করিয়া দেখে না, যে অস্মিতা বা অহঙ্কার হইতেছে সংসারের মূল তাহা বিনষ্ট হয়, সেই সঙ্গে সংসারও পুরুষের পক্ষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু দেখা যায় যে, কেহ এইরূপ মুক্তিলাভ করিলে জগৎ যেমন চলিতেছিল, প্রকৃতির খেলা যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে থাকে, তাহার কোন ব্যতিক্রমই হয় না। এই জন্য সাংখ্য বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে—কোথাও এক পুরুষ মুক্ত হইতেছে, তাহারই পক্ষে সংসার বিলুপ্ত হইতেছে, কিন্তু অন্যান্য বহু পুরুষ অহং জ্ঞানে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রকৃতির লীলায় বদ্ধ রহিয়াছে—তাই জগৎ কখনই একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে না। সাংখ্যের এই বিশ্লেষণে বিশ্বলীলার সকল প্রশ্নের সমাধান নাই—তবে দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তাহার পক্ষে এই জ্ঞানই যথেষ্ট এবং সেই জন্যই সাংখ্য আর ইহার অধিক অগ্রসর হইবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই।

আমরা দেখি বুদ্ধও নিজের ভাবে এই সাংখ্যমার্গেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে দার্শনিকতার দিক দিয়া সাংখ্য যতদূর অগ্রসর হইয়াছে বুদ্ধ ততদূরও যাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। সংসার দুঃখময়, এই দুঃখের উচ্ছেদ করিতে হইবে—সাংখ্যের এই আরম্ভ বুদ্ধেরও আরম্ভ। সাংখ্য দেখাইয়াছে, আমরা যে অনুভব করি—"আমি" সুখভোগ করিতেছি, "আমি" দুঃখ ভোগ করিতেছি—এই "আমি" বোধ বা অহঙ্কার হইতেছে ভ্রান্তি; পুরুষের শুদ্ধ চৈতন্যে এই অহংবোধ নাই, ইহা হইতেছে প্রকৃতির সৃষ্টি, এবং এই সংসার প্রকৃতির লীলা, তাহা অনিত্য। বুদ্ধও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন, "আমি" বলিয়া বস্তুতঃ কিছু নাই—এইটি উপলব্ধি হইলেই সকল দুঃখের অবসান হয়; ইহাই সকল বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথা—অনাত্মবাদ। সাংখ্যের ন্যায়ই বৌদ্ধগণ কোন একমেবাদ্বিতীয়ং সদ্বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, এবং সাংখ্যের ন্যায়ই তাঁহারা জগতের অনিত্যতার উপর জোর দিয়াছেন। তবে সাংখ্য যে বলিয়াছে "আমি" লুপ্ত হইলে পুরুষ তাহার শুদ্ধ চৈতন্যে ফিরিয়া যাইবে এবং প্রকৃতি তাহার অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে—বুদ্ধ ইহা স্বীকার করেন নাই; তবে তিনি অস্বীকারও করেন নাই,—এ-সব দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করা তিনি সমীচীন বিবেচনা করেন নাই। বুদ্ধের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন ছিল সকল দুঃখের অবসান করা। বিষাক্ত শরের দ্বারা বিদ্ধ কোন ব্যক্তি যদি তৎক্ষণাৎ সেই শরটিকে বাহির করিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া ঐ শর কোথা হইতে আসিল, কে নির্ম্মাণ করিয়াছে, কে নিক্ষেপ করিয়াছে এই সব তর্ক লইয়া সময় নষ্ট করে, সে যেমন মূর্খতার পরিচয় দেয়, তেমনিই যে-ব্যক্তি এই সংসারে দুঃখ-তাপে জর্জ্জরিত অবস্থায় থাকিয়া আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনায় প্রবৃত্ত হয় সেও তেমনিই মূর্খতার পরিচয় দেয় (Majjhima-Nikaya-Sutta, 63)।

অনেকেই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, ভারতবাসী চিরকাল ভাব-বিলাসী, দার্শনিক চিন্তায় সময় নষ্ট করিয়া বাস্তব জীবনে অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিয়াছে। তাঁহারা ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় জীবনধারার সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করেন নাই। ভারত চিরকালই অধ্যাত্মভাবাপন্ন, কিন্তু তাহার অর্থ নহে যে, সে বৃথা চিন্তাবিলাসেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়াছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, চারুকলা—যাহা কিছু একটা সভ্য জাতির

মহত্ত্বের ও গৌরবের পরিচয়—সে-সকল ক্ষেত্রেই ভারত অসাধারণ কর্ম্মশক্তির ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছে—তাহার অধ্যাত্ম-প্রবণতা তাহাতে প্রতিবন্ধক হয় নাই। এমন কি অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রেও ভারত যে বৃথা চিন্তাবিলাসে চিরকাল মগ্ন ছিল না, বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে বৌদ্ধধর্ম্মকে লোকে জীবন-বিরোধী শূন্যবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, সেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতার জীবনেই আমরা দেখিতে পাই তিনি কিরূপ কাজের লোক ছিলেন, এবং অলস তর্কে সময় ও শক্তি নষ্ট করাকে তিনি কিরূপ নিরুৎসাহিত করিয়াছেন।

ইহার অর্থ নহে যে, তিনি যুক্তি তর্কেব ব্যবহার করিতেন না। বস্তুতঃ বুদ্ধকেই ভারতের প্রথম rationalist বা যুক্তিবাদী বলা যাইতে পারে। বিনা যুক্তি ও সমালোচনায় কোন জিনিষ গ্রহণ করিতে তিনি তাঁহাব শিষ্যগণকে নিষেধ করিতেন—এই জন্য তিনি ভারতের অন্যান্য দার্শনিকের ন্যায় শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি মানবের দুঃখনিবৃত্তির যে কার্য্যকরী পন্থা দেখাইয়া দিয়াছিলেন তাহার যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করিতে তিনি মানবজীবনের গভীর মূলের সন্ধান করিয়াছিলেন এবং যুক্তির সাহায্যেই তাহা লোককে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তবে সেজন্য ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনায় কোন লাভ হইবে না বলিয়া তিনি সে সব বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার কার্য্যকরী উপদেশ-সকলের মধ্যে এই সব দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত ছিল তাহার অনুসরণেই পরবর্ত্তিকালে নানা বৌদ্ধদর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল; এবং ইহাও হইয়াছিল শুধু চিন্তা-বিলাসিতার জন্য নহে—বুদ্ধ যে সাধনার অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেখাইয়া দিয়াছিলেন লোককে তাহা লওয়াইবার জন্য এবং বিরুদ্ধ মতবাদীদের সুতীব্র আক্রমণের জবাব দিবার জন্য বৌদ্ধগণকে দার্শনিক চিন্তাশীলতার বিকাশ করিতে হইয়াছিল।

বস্তুতঃ এইটিই হইতেছে ভারতের সকল ধর্ম্মের বিশেষত্ব—এখানে এমন কোন ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই যাহা উচ্চ দার্শনিক যুক্তির দ্বারা সমর্থিত নহে, অন্যপক্ষে এখানে এমন কোন দার্শনিক মতের উদ্ভব হয় নাই যাহাকে মানবজীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয় নাই—ভারতের সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই হইতেছে সাধক সম্প্রদায়। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ভারতে দর্শন হইতে ধর্ম্মকে এবং উভয়কেই বিজ্ঞান বা জীবন হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন

করা হয় নাই—এই সবই এখানে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যে ও সহযোগিতায় বিকশিত হইয়াছিল। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, আজ পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্ম আধুনিক যুক্তিতর্কের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতেছে না—কিন্তু ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা তাহার দ্বারা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কারণ তাহার ভিত্তি গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা সমুচ্চ চিন্তাশীলতার দ্বারা সমর্থিত।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তবে ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মসাধনার বিরুদ্ধে অজ্ঞ সমালোচনার দ্বারা লোকের মনে আজকাল যে-সব ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হয় সে-সবের খণ্ডন করা আবশ্যক। বুদ্ধের বচনগুলি তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া পালি ভাষায় ত্রিপিটক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে—এই গুলিই সকল বৌদ্ধ দর্শনের মূল। পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ নিজ নিজ অনুভূতি ও যুক্তির আলোকে এই সকল বচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতেই বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শাখাগুলিকে ছাড়িয়া দিলেও, বৌদ্ধ দর্শনের ত্রিশটি শাখার সন্ধান পাওয়া যায় (Systems of Buddhistic Thought by Yamakami Segen, p. 3). আমরা এখানে বৌদ্ধ দর্শনের কয়েকটি প্রধান ধারারই কিছু পরিচয় দিতেছি—কারণ তাহা দ্বারা গীতার শিক্ষার উপর কিছু আলোকসম্পাত করা হইবে।

আমরা উপরে দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের সহিত বুদ্ধের শিক্ষার মিল রহিয়াছে। প্রভেদ এই যে, বৌদ্ধগণ সাংখ্যের ন্যায় কোন শাশ্বত পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদের মতে চৈতন্য আছে, তাহা ত আমরা উপলব্ধিই করিতেছি—কিন্তু চৈতন্যময় কেহ নাই—চৈতন্যময় একজন পুরুষ বা আত্মা রহিয়াছে বলিয়া আমাদের যে অনুভব হয় এটা ভ্রান্তি। বিখ্যাত "অনাত্মা লক্ষণ সুত্তে" (অনাত্মলক্ষণ সূত্র) বুদ্ধদেব বলিতেছেন—"হে ভিক্ষুগণ, দেহ অনাত্ম। যদি দেহে আত্মা থাকিত তাহা হইলে দেহ দুঃখময় হইত না। 'আমার দেহ এইরূপ হউক, আমার দেহ ঐরূপ হউক' এ সম্ভাবনাও থাকিত। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু দেহ অনাত্ম, ইহা দুঃখময় এবং আমার দেহ এইরূপ হউক, আমার দেহ ঐরূপ হউক এ সম্ভাবনাও নাই।"

যেমন দেহ সম্বন্ধে তেমনিই সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে ঐ একই যুক্তি প্রয়োগ

করা যায়—জগতের মূলে যদি কোন শাশ্বত আত্মা বা চৈতন্যময় পুরুষ বা ভগবান থাকিত তাহা হইলে জগৎ দুঃখময় হইত না, অনিত্য হইত না। দুঃখময় অনিত্য দেহ বা জগতের সহিত শাশ্বত, শান্তিময়, চৈতন্যময় আত্মার কোনরূপ সামঞ্জস্য করা যায় না, একই সঙ্গে দুইয়ের অস্তিত্ব অথবা এক হইতে অন্যের প্রকাশ বা উদ্ভব কল্পনা করা যায় না। অতএব এই মতবাদ অগ্রাহ্য। আমরা দেখিতে পাই বৌদ্ধগণের এই মত পরবর্ত্তী সকল দর্শন ও ধর্ম্মকে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

সাধারণ মানুষ এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগৎকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। যাহারা এখনও নিম্নতম স্তরে রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে তামসিকতার প্রভাব সমধিক তাহারা জীবনে যাহা পাইয়াছে, জীবন যেমন চলিতেছে তাহাতেই সন্তুষ্ট—ইহার অধিক তাহারা কিছু পাইতে চায় না, হইতে চায় না, জানিতে চায় না। ইহাদের জীবন অনেকটা পশুর ন্যায়। কিন্তু যাহাদের মধ্যে রজো-গুণের প্রাধান্য তাহারা নিত্য নূতন ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে, জগৎকে যেন টানিয়া ছিঁড়িয়া নূতন করিয়া গড়িতে চায়—যেন তাহাদের ভোগের তৃপ্তি হয়। কিন্তু দেখা যায়, এ জগতে কোন ভোগেই তৃপ্তি নাই—শেষ পর্য্যন্ত মানুষ ব্যর্থ ও হতাশ হইয়া এই জগতের সব কিছুই মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উপলব্ধি করে—

'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান'।

যাহাদের মধ্যে সত্ত্ব-গুণের প্রাধান্য তাহারা বুদ্ধির দ্বারা সত্যের সন্ধান করে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা দেখে কোন সত্য সম্বন্ধেই নিশ্চিত হওয়া যায় না। আজ যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে কাল তাহা মিথ্যা বলিয়া বর্জ্জিত হইতেছে। এ জগতে প্রকৃত সুখ নাই, শান্তি নাই, সত্য নাই। এই ভাবেই শূন্যবাদ মায়াবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। আর আমাদের দেশের দুইজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি—বুদ্ধ ও শঙ্কর—এই মতটি বিশেষ শক্তির সহিত প্রচার করিয়াছেন। জগতে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কত আন্দোলন, কত প্রয়াস যে হইয়া গিযাছে তাহার অন্ত নাই, কিন্তু সংসারে মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার এতটুকু লাঘব হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না—সংসারের উন্নতি করার সকল চেষ্টাই যেন কুকুরের লেজকে সোজা করিবার প্রয়াসের মতই ব্যর্থ। তাহা হইলে এই দুঃখময় সাংসারিক জীবন হইতে কোন রকমে মুক্তি লাভ করাই কি

মানুষের প্রধানতম লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে? বৌদ্ধগণ তাই নির্ব্বাণের পথ ও উপায দেখাইয়া দিয়াছেন, জীবনেব সঙ্গে সঙ্গে জীবনেব সকল দুঃখেব নির্ব্বাণ ও অবসান—ইহাই মানুষেব সকল চেষ্টা, সকল সাধনাব চরম ও এক মাত্র লক্ষ্য হওযা উচিত।

কিন্তু এই দুঃখময় জগৎ কেমন কবিযা উৎপন্ন হইল? এই প্রশ্নেব উত্তব তিন বকমেব হইতে পাবে। জডবাদ, মাযাবাদ, সত্যবাদ। এক উত্তব হইতেছে জডবাদীব—এই জগৎ জডশক্তিব সৃষ্টি, এখানে ঘটনাক্রমে যে চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাব এমন কোন সামর্থ্য নাই যে অন্ধ জড শক্তির ক্রিযাকে নিজ ইচ্ছামত নিযন্ত্রিত কবিতে পাবে—অতএব এ জগতে দুঃখ, যন্ত্রণা, অপূর্ণতা অনিবায্য। যাহাবা পবজন্মে বিশ্বাস কবে না তাহাদের মতে মৃত্যুতেই এই দুঃখময মানব জীবনেব চিবনির্ব্বাণ, যতদিন বাঁচিয়া আছ এই জগতে যতটুকু ভোগসুখ আছে পূর্ণভাবেই ভোগ কবিযা লও।

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

পাশ্চাত্য জগতে এই মতেবই প্রাধান্য। আমাদেব দেশেও ইহা অতি প্রাচীন চার্ব্বাক মত বলিযা প্রসিদ্ধ। কিন্তু যাহাবা পবজন্মে বিশ্বাস কবে, তাহাদেব মতে এইভাবে ভোগে আসক্ত হইলে কোন দিনই জীবনেব অবসান হইবে না, মানুষ যেমন কর্ম্ম কবিবে তেমনিই ফল ভোগ কবিতে পুনঃ পুনঃ তাহাকে জন্মগ্রহণ কবিতে হইবে। আব জন্মেব অর্থই হইতেছে জবা ব্যাধি মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের কবলে পতিত হওয়া—এ জগতে সুখ কেবল নাম মাত্র, দুঃখই সত্য। এই দুঃখ এড়াইতে হইলে যাহাতে আর জন্ম না হয তাহাই কবিতে হইবে, তাহাই নির্ব্বাণ। বৌদ্ধগণ এই নির্ব্বাণ লাভেবই সাধনা দেখাইয়া দিয়াছেন। এই সংসার মিথ্যা, আমাদের যে অহংবোধ ইহা মিথ্যা—সর্ব্বদা এই ধ্যান করিতে করিতেই আমাদেব ভোগবাসনা ও আসক্তিব ক্ষয় হয় এবং ইহার ফল স্বরূপ সকল পাপ হইতে আমবা মুক্ত হই, তখনই আমরা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই। নির্ব্বাণের পব কি থাকিবে সে সম্বন্ধে বৌদ্ধদের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, নির্ব্বাণেব পব আব কিছুই থাকে না—সব সত্তার লোপ হইয়া যায়। কেহ বলেন, নির্ব্বাণে চৈতন্যেরই লোপ হয় এবং সেই সঙ্গে সুখদুঃখের লোপ হয়—কিন্তু যে জড়সত্তার মধ্যে এই চৈতন্যের উদ্ভব

হইয়াছে তাহা থাকিয়া যায়। এই মত একদিক দিয়া পাশ্চাত্য জড়বাদের অনুরূপ, অন্য দিক দিয়া ভারতীয় সাংখ্য মতের অনুরূপ। সাংখ্য মতে এই জগৎ জড় প্রকৃতিরই অভিব্যক্তি—তবে পাশ্চাত্য জড়বাদের সহিত সাংখ্যমতের প্রভেদ এই যে, এই জড় প্রকৃতির মধ্যে কেমন করিয়া চৈতন্যের উদয় হইল জড়বাদ তাহার কোনই ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য জড় প্রকৃতির অতিরিক্ত চৈতন্যময় পুরুষের কল্পনা করিয়া ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছে। পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি সক্রিয় হইযা উঠে, পুরুষের চৈতন্য প্রতিফলিত হওয়ায় প্রকৃতিও চৈতন্যময় বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং পুরুষ প্রকৃতির সেই সকল ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলিয়া ভ্রম করে এবং এই ভাবেই হয় পুরুষের সংসারলীলা, জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ বোধ। পুরুষ যখন নিজের এই ভ্রম বুঝিতে পারে, নিজেকে প্রকৃতি হইতে পৃথক বলিয়া উপলব্ধি করে, প্রকৃতির ক্রিযায় আর সম্মতি না দেয়—তখনই প্রকৃতির ক্রিয়া বন্ধ হয়, পুরুষ তাহার শুদ্ধ চৈতন্য ফিরিয়া পায়, তাহার জীবনলীলার, সংসারলীলার অবসান হয়। বৌদ্ধগণের মতে ইহাই নির্ব্বাণ, তাহারা প্রকারান্তরে এই সাংখ্যমতই গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণে চৈতন্যের লোপ হয়—তাহার পর থাকে প্রাণহীন, চৈতন্যহীন, ক্রিয়াহীন, অভিব্যক্তিহীন জড় সত্তা। এই সত্তা সাংখ্যগণের অব্যক্ত প্রকৃতিরই অনুরূপ। পুরুষ মুক্ত হইলে প্রকৃতি যে অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যায়—এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে তাহাই নির্ব্বাণ। কিন্তু বৌদ্ধগণ চৈতন্যময় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না —অতএব তাঁহাদের মতে নির্ব্বাণের পর থাকিবে শুধু চৈতন্যহীন জ্যোতিহীন কর্ম্মহীন অনন্ত মৃত্যু। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে এইটি হইতেছে বৌদ্ধ বৈভাসিক সম্প্রদায়ের মত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত এই মতের বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে। বিজ্ঞানের মতে, এই বিরাট বিশ্ব প্রায় দুইশত কোটি বৎসর পূর্ব্বে ঘন উত্তপ্ত বাষ্প (gas) রূপে বিদ্যমান ছিল। সেই বাষ্পরাশি যেমন অনন্ত আকাশে বিস্তৃত হইতে থাকে তেমনই তাহা বহু বিচ্ছিন্ন মেঘে পরিণত হয়, সেই মেঘগুলিই ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হয়। আমাদের সূর্য্য এমনিই একটি নক্ষত্র। এই নক্ষত্রগুলি যেমন পরিমাণে সঙ্কুচিত হইতেছে তেমনই

অধিকতর উষ্ণ হইতেছে। এইভাবে আমাদের সূর্য্যও ক্রমশঃ উষ্ণতর হইতেছে। হঠাৎ এমন একদিন আসিবে যখন সূর্য্য তাহার পৃথিবী আদি গ্রহ সকলকে লইয়া জ্বলিয়া উঠিবে, আমাদের এই শস্যশ্যামলা পৃথিবী, তাহার জীবজন্তু, তাহার মানুষ, মানুষেব সব কীর্ত্তি লইয়া জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় পরিণত হইবে। তাহার পর সূর্য্য খুব ক্ষুদ্র হইয়া ক্রমে একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। এইভাবে বিশ্বের সকল নক্ষত্র ও সূর্য্য একদিন নিভিয়া যাইবে, সকল আলোক, সকল গতি, সকল জীবন বিলুপ্ত হইবে—থাকিবে শুধু অনন্ত-প্রসারিত শূন্যগভ এমন অন্ধকার যাহা কল্পনা করিবার সাধ্য আমাদের নাই। ইহাকেই বিশ্বের পরিনির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পর কি হইবে? আব ঐ যে উত্তপ্ত বাষ্পরূপে বিশ্বের জীবন আরম্ভ তাহাই বা কোথা হইতে আসিল? বিজ্ঞান এ-সব প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিবে এ ভরসা করা যায় না।

বৌদ্ধগণেব মতে অনন্ত শূন্যেব মধ্যে কোন রকমে শক্তির খেলা আরম্ভ হইয়াছিল—তাহা হইতেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে, সেই শক্তিব খেলা বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই জগৎও লুপ্ত হইবে, অনন্ত শূন্যই চির বিরাজিত থাকিবে। এই শক্তির খেলাকেই তাহারা "কর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়াছেন। গীতাও সৃষ্টিক্রিয়াকে "কর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়াছে, ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (৮।৩)। তবে গীতা শূন্যের উপর এই জগৎলীলাকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই—গীতার মতে এই জগৎ হইতেছে ব্রহ্মেব মধ্যে অধ্যাত্ম-শক্তির ক্রিযা, আর ব্রহ্ম হইতেই কর্ম্মেব উদ্ভব—কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি। বৌদ্ধগণ শূন্য বলিতে প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বসত্তার অভাব বুঝেন নাই। নাগার্জ্জুন শূন্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে তাহা নির্গুণ ব্রহ্মেরই নামান্তর। সম্ভবতঃ প্রাচীন বৌদ্ধমতে শূন্য হইতেই জগতের উদ্ভব কল্পনা করা হইত, কিন্তু গীতার শিক্ষার প্রভাবে শূন্য সম্বন্ধে তাঁহাদের পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন হয়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, বৌদ্ধ বৈভাসিকগণের মতে নির্ব্বাণের দ্বারা সর্ব্বসত্তার লোপ হয় না বটে, কিন্তু চৈতন্যেব লোপ হয়—থাকে শুধু জড়সত্তা। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই জন্মান্তর স্বীকার করিয়াছে। এই দেহের মৃত্যুর পর যদি জীবের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে জীবের চৈতন্য দেহের

অধীন নহে, দেহ ছাড়াও তাহা বিদ্যমান থাকে। তাহা হইলে জড়কেই পরম সত্তা বলা যায় না। বস্তুতঃ বৌদ্ধগণ জড়বাদী নহেন, তাঁহারা চৈতন্যবাদী— তাঁহাদের মতে এই জগৎ চৈতন্যেরই লীলা।

স্থূল জড়বাদ হইতে জগৎ-ব্যাপারের সম্যক ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আমাদের মন বুদ্ধির দ্বারাই আমরা জড়জগৎকে জানি—অতএব মন বুদ্ধির চৈতন্য জড়জগৎ অপেক্ষা কম সত্য নহে, আর এই চৈতন্যের স্বরূপ ও ক্রিয়া জড়ের ক্রিয়া হইতে এত বিভিন্ন যে ইহাকে জড়েরই একটি ক্রিয়া বলিয়া ধারণা করা যায় না। জড়জগতে যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখা যায় তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে, এই জগতের মূলে এক চৈতন্যময় সত্তা রহিয়াছে। বস্তুতঃ আধুনিক বিজ্ঞানও উত্তরোত্তর এইরূপ অভিমতের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলে আমাদের মূল প্রশ্নটির সমাধান কেমন করিয়া হয়? জগতের মূলে যদি চৈতন্য থাকে তাহা হইলে জগতে এত বিশৃঙ্খলা কেন, বিরোধ কেন, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি তীব্র দুঃখ কেন? এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর সম্ভব। প্রথম উত্তর এই যে, জগৎ বলিয়া আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা ভ্রান্তি, মায়া; যতক্ষণ এই ভ্রান্তি আছে ততক্ষণই জগৎ আছে, সংসার আছে, সুখ-দুঃখ আছে—এই ভ্রান্তি দূর হইলেই সংসারের সহিত সকল সুখ-দুঃখের অবসান হয়,—চৈতন্য নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাতে দুঃখ, দ্বন্দ্ব, অশান্তির লেশ মাত্র নাই। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন দ্বিতীয় শতকে এইটিই বুদ্ধের মত বলিয়া প্রচার করেন, "মায়া" শব্দটি এইরূপ ভ্রান্তি অর্থে তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন আর শঙ্কর সেইটিই ঈষৎ ইতর-বিশেষ করিয়া অষ্টম শতকে গ্রহণ করেন। নাগার্জ্জুনের এই মত শূন্যবাদ বলিয়া প্রখ্যাত, কিন্তু এই নাম হইতে ইহা বুঝা ভুল হইবে যে, তাঁহার মতে কোন শাশ্বত সত্তা নাই। তাঁহার মত হইতেছে, আমরা জগৎকে যেরূপ দেখি, the phenomenal world, ইহাই ভ্রান্তি, মায়া—বুদ্ধ যে জগতের অনিত্যতা, অনাত্মতার কথা বলিয়াছেন তাহা ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু এই ব্যবহারিক জগতের ঊর্দ্ধে এক শাশ্বত সত্তা আছে তাহা বাক্য মনের অগোচর, সেইজন্যই বুদ্ধ তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে সম্মত হন নাই। সেই সত্তা অনির্ব্বচনীয় বলিয়াই নাগার্জ্জুন তাহাকে শূন্য শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন, আর তাহার বর্ণনা করিতে তিনি কতকগুলি

নেতি-বাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন উহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অচ্ছিদ্র, অদাহ্য, অবিনাশী—এই শূন্যতার নামই বজ্র। মনে আমরা উহা ধারণা করিতে পারি না, অথচ উহা যে আছে তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে নাগার্জুন কেমন বৌদ্ধদর্শনকে বেদান্ত-দর্শনেরই সমরূপ করিয়া দিয়াছেন। গীতা বেদান্তের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহার দ্বারাই বৌদ্ধদর্শনের এইরূপ পরিণতি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গীতাও আত্মতত্ত্বের বর্ণনা করিতে অনুরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে (২।২৩,২৪)। এই শূন্যবাদের সহিত বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভেদ এই যে, তাঁহারা শাশ্বত সত্তাকে একেবারে শূন্য না বলিয়া জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ বলিয়াছেন—তবে তাঁহাদের মতেও বাহ্য জগতের কোন অস্তিত্বই নাই, জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞেয় অসৎ। এই মতও বেদান্তের অনুযায়ী—বেদান্ত ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়াছে। * বেদান্ত মতে ব্রহ্মের যে পরমতম সত্তা তাহা অনির্ব্বচনীয়; বৌদ্ধমতে ইহাই শূন্য। কিন্তু ব্রহ্ম যখন জগৎরূপে আত্মপ্রকাশ করেন তখন তিনিই হন সচ্চিদানন্দ; বৌদ্ধমতে ইহাই বিজ্ঞান। তবে বেদান্ত বৌদ্ধগণের ন্যায় জগৎকে কোথাও মিথ্যা মায়া বলে নাই—ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধগণের এই মত খণ্ডন করা হইয়াছে। কিন্তু জগৎ যদি সত্য হয় এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই আত্মপ্রকাশ হয়, তাহা হইলে জগতে এত দুঃখ কেন, দ্বন্দ্ব কেন, অপূর্ণতা কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জগতের দুঃখময়তার ব্যাখ্যা করিতে বৌদ্ধগণ যে মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন তাহার দ্বারা এই সমস্যার বস্তুতঃ কোন সমাধানই হয় না। শান্তিময়, আনন্দ-ময়, চৈতন্যময় নির্ব্বাণ, শূন্য বা বিজ্ঞানই যদি শাশ্বত সত্য হয় তাহার মধ্যে এই মায়ার আবির্ভাব কেমন করিয়া হইল? বৌদ্ধগণ ব্যাখ্যা করেন যে, জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মের ফলে আমাদের মনে যে-সব সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে তাহাই মায়া বা অবিদ্যারূপে জগৎ-ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু এই কর্ম্মের আরম্ভ কোথায় কখন কেমন করিয়া হইল? এ প্রশ্নের কোন উত্তর বৌদ্ধগণ দিতে পারেন না। শঙ্করও মায়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—উহা সৎও নহে, অসৎও নহে—উহা অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু

* সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয়, ২।১

এইরূপ মায়াতত্ত্বের দ্বারা জগৎব্যাপারের বস্তুতঃ কোন ব্যাখ্যাই হয় না—কেবল কথার জাল বুনিয়া ব্যাখ্যাকে এড়াইয়া যাওয়া হয়। দার্শনিক মত হিসাবে ইহাই হইতেছে মায়াবাদের চরম দুর্ব্বলতা—জগৎ ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া ইহা সেটিকে শেষ পর্য্যন্ত অব্যাখ্যাত রহস্যরূপেই রাখিয়া দেয়।

আমরা দেখিলাম জড়বাদ বা মায়াবাদ কোনটির দ্বারাই জগৎতত্ত্বের সুমীমাংসা হয় না। বাকী থাকে ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য—এই সর্ব্বসত্যবাদ। বস্তুতঃ এইটিই উপনিষদ ও বেদান্তে প্রচারিত চরম সত্য এবং গীতায় এই মতই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু জগৎ যদি সত্য হয় এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই সৃষ্টি হয় তাহা হইলে জগতে এত দুঃখ কেন, অজ্ঞান কেন, অপূর্ণতা কেন? ইহার উত্তর এই যে, ভগবান জগৎকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। জীব এই দুঃখময় সংসারে আসিয়া দুঃখকে জয় কবিবে, দুঃখকেই রূপান্তরিত করিয়া পরম অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উপাদানে পরিণত করিবে, এই মর্ত্ত্যলোকেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করিবে। ভগবান আনন্দময়, আনন্দই তাঁহার স্বরূপ, তিনি আত্মানন্দ—আপনার আনন্দে আপনি বিভোর; তিনি একমাত্র সত্য, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেহ নাই, তিনিই একমাত্র সৎ বস্তু; তিনি চৈতন্যময়—তাঁহার জ্ঞান নিজেরই জ্ঞান, তিনি নিজেই নিজের অনন্ত সত্তাকে জানেন—এইভাবে তিনি সচ্চিদানন্দ। মানব-মন পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা মহত্তর ধারণা আর কিছু করিতে পারে না। তাঁহার সত্তা অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত, আনন্দ অনন্ত—নিজেকে তিনি বহু দিক দিয়া বহুভাবে দেখিতেছেন, জানিতেছেন, নিজেকে তিনি বহু ভাবে উপভোগ করিতেছেন—ইহাই তাঁহার জগৎ-লীলা। দুঃখকে, অজ্ঞানকে, অপূর্ণতাকে জয় করার যে অপূর্ব্ব আনন্দ, বহু জীবরূপে তাহাই আস্বাদন করিবার জন্য নিজ মায়াশক্তি বলে তিনিই জীব-জগৎরূপে প্রকট হইয়াছেন। এই মায়াশক্তি ভ্রান্তি-বিলাসিনী নহে, ইহা ভগবানেরই চিৎশক্তি, গীতায় ইহাকে পরা প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জগতে মানুষ যে দুঃখ ভোগ করিতেছে—ইহা কেবল সাময়িক; এই দুঃখময় জগতে কর্ম্ম করিয়া, সংগ্রাম করিয়া, সাধনা করিয়া ইহাকে জয় করিতে হইবে—এইখানেই সমৃদ্ধ রাজ্য, দিব্যজীবন ভোগ করিতে হইবে—ইহাই গীতার শিক্ষা। গীতা প্রথম দুইটি কথাতেই সংসারের স্বরূপ ব্যক্ত

করিয়াছে—ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে। এই সংসার এক বিরাট সংগ্রামক্ষেত্র—এখানে বিরুদ্ধ শক্তি সকলের সহিত সংগ্রাম করাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম। এই সকল শত্রুকে জয় করিয়া এই পৃথিবীতেই রাজ্যং সমৃদ্ধং, দিব্যজীবন ভোগ করাই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য।

মূলতঃ ইহাই শ্রীঅরবিন্দের মত। তবে ভাগবত চৈতন্য কি প্রণালীতে নিজেকে জড়ে পরিণত করিল, এই জড়েব মধ্যে যে দিব্য জীবনের বিকাশ হইবে তাহার স্বরূপ কি—এ-সব প্রশ্নের সমাধান গীতায় বা অন্য কোন বৈদান্তিক গ্রন্থে নাই। এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর পাওয়া যায় নাই বলিয়াই মায়াবাদের ন্যায় দার্শনিক মতবাদেব উদ্ভব হইয়াছিল; চৈতন্যময় ব্রহ্ম কখনই নিজেকে জড়ে পরিণত করিতে পারেন না অতএব এই জড় জগৎ মিথ্যা, ভ্রান্তি, মায়া—এই মত প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Life Divine গ্রন্থে এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিব্য জীবনের দার্শনিক ভিত্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গীতার যুগে এ সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। সংসার অনিত্য ও দুঃখময় বলিয়া সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগের আদর্শ বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইতেছিল—গীতা সেই সমস্যারই সমাধান করিয়া বলিয়াছে যে, সংসার অনিত্য ও দুঃখময় হইলেও মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ কবিরা এই সংসারেই দিব্য সুখ ও শান্তি ভোগ করিতে পারে এবং নির্ব্বাণ লাভের পরও সংসার থাকে, সংসারে কর্ম্ম থাকে। কি সাধনার দ্বারা মানুষ এইরূপ অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিতে পারে গীতা তাহারই কার্য্যকরী পন্থাটি, সাধনাটি দেখাইয়া দিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই গীতার এই শিক্ষা বৌদ্ধধর্ম্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। গীতারই প্রভাবে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম মহাযানে পরিণত হইয়াছিল। গীতার মতে নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ হইতেছে—ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে ক্ষুদ্র অহং ভাবের নির্ব্বাণ এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বাসনা কামনার নির্ব্বাণ। তখন মানুষ ভিতরে পায় অসীম উদারতা, অনন্ত শান্তি, সর্ব্বতোমুখী সমতা। সেই সমতা ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করাই গীতার আদর্শ। এইটিই যে বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিকগণ তাহা বিশেষ দক্ষতার সহিত বুঝাইয়া দিয়াছেন। নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন, এই সংসার মূলতঃ কি তাহা যাঁহারা জানেন তাঁহারা এই সংসাবের মধ্যেই নির্ব্বাণ লাভ করেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সংসার ছাড়িয়া

যাইতে হয় না, ন সংসারস্য নির্ব্বাণাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্ (মাধ্যমিক শাস্ত্র, ২৫।১৯)। ইহা গীতারই শিক্ষা।

ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ। ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভের জন্য প্রয়োজন হইতেছে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া। বৌদ্ধগণও নির্ব্বাণ বলিতে ইহাই বুঝিয়াছেন—চৈতন্যকে রাগদ্বেষাদি "ক্লেশ" হইতে মুক্ত করা। ইহার জন্য প্রয়োজন হইতেছে জ্ঞান। প্রতিসংখ্যা (প্রজ্ঞা) বা উচ্চতম জ্ঞানের দ্বারা রাগাদি ক্লেশ ও অশুদ্ধি নিরুদ্ধ হয় বলিয়া বৌদ্ধ বৈভাসিকগণ নির্ব্বাণের আর এক নাম দিয়াছেন—প্রতিসংখ্যা-নিরোধ। গীতাও এখানে বলিতেছে, ঋষয়ঃ অর্থাৎ যাঁহারা সত্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকল পাপ ও মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। গীতা নির্ব্বাণ বলিতে একেবারে সত্তার বিলোপ বুঝে নাই—আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করে, ব্রহ্মভূতঃ, এবং গীতার মতে তাহাই নির্ব্বাণ। বৌদ্ধগণও সাধারণতঃ নির্ব্বাণ বলিতে সত্তার সম্পূর্ণ বিলোপ বুঝেন নাই—তাঁহাদের মতে নির্ব্বাণ হইতেছে নিত্য চিরস্থায়ী —তাহা ব্যাবহারিক জীবনের সকল ত্রুটি, পাপ, অপূর্ণতা হইতে মুক্ত—নিত্যঃ খলু প্রতিসংখ্যা-নিরোধঃ, তস্য কিং সভাগহেতুনা প্রয়োজনম্ (অভি-ধর্ম্মকোষ-ব্যাখ্যা)। এই অবস্থা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সিদ্ধ পুরুষগণের আত্মোপলব্ধিতেই ইহা লব্ধ হয়। অতএব বৌদ্ধগণের নির্ব্বাণ আর বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রাপ্তি একই।

বৌদ্ধগণের মতে যে পরম জ্ঞানের দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ করা যায় তাহা হইতেছে নৈরাত্ম্যদর্শন, এবং এইটিই হইতেছে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনের মূল কথা। অহং জ্ঞানই হইতেছে সংসারে সকল দুঃখ ও পাপের মূল; বস্তুতঃ অহং বলিয়া কিছুই নাই, ইহা মিথ্যা, মায়া—এই উপলব্ধিই নৈরাত্ম্যদর্শন। গীতাও এই মিথ্যা অহংজ্ঞান দূর করিবার শিক্ষা দিয়াছে—এই পঞ্চম অধ্যায়েই বলিয়াছে যোগিপুরুষ সকল কর্ম্ম করিয়াও "আমি" করিতেছি বা করাইতেছি এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন না। অন্যত্রও গীতা নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইয়া কর্ম্ম করিতে, যুদ্ধ করিতে বলিয়াছে। কিন্তু গীতা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাই—আত্মাই আমাদের মূল শাশ্বত সত্তা, এই সত্তায় আমরা ব্রহ্মের সহিত, সর্ব্বভূতের সহিত এক—অজ্ঞানের বশে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহংকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম

করি, সাধনার দ্বারা এই অজ্ঞান দূর হইলে আমাদের মধ্যে সেই আত্মা স্বতঃ-প্রকাশিত হয় (৫।১৬)। বৌদ্ধগণ কি অহংয়ের অতিরিক্ত শাশ্বত সত্তা স্বরূপ এইরূপ কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ? বৌদ্ধদের নৈরাত্ম্যদর্শন কথা হইতেই মনে হয় তাঁহারা আদৌ আত্মা বা কোন শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু গীতা নির্ব্বাণের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে—নৈরাত্ম্যদর্শনের প্রকৃত অর্থ হইতেছে অহং-ভ্রান্তি নিরসন। আমরা উপরে দেখিয়াছি—বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণকে নিত্য বলিয়াছেন, অতএব তাঁহারা কোন শাশ্বত সত্তা স্বীকার করেন নাই—এ কথা কেমন করিয়া বলা যায় ? যাহাই হউক গীতা নির্ব্বাণের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহা পরবর্ত্তী বৌদ্ধ মতকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের প্রবর্ত্তক বসুবন্ধু তাঁহার 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' গ্রন্থে বলিয়াছেন, বালবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অহংকে যে আত্মা বলিয়া মনে করে সেই কল্পনার আত্মা সম্বন্ধেই নৈরাত্ম্য বুঝিতে হইবে, বুদ্ধগণের উপলব্ধ অনির্ব্বচনীয় আত্মার পক্ষে কিন্তু নহে, ন তু অনভিলাপ্যেনাত্মনা যো বুদ্ধানাং বিষয়ঃ। গীতা আত্মাকে অনির্ব্বচনীয়ই বলিয়াছে,

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ২।২৪

এই আত্মায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করিলে আত্মজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পাপ ও মলিনতা ধৌত হইয়া যায় (৫।১৭)। মুণ্ডকোপনিষদের সহিত গীতার এই শ্লোকগুলির ভাবে ও ভাষায় বেশ মিল আছে। সেখানেও বলা হইয়াছে, দ্রষ্টা যখন সেই স্বর্ণকান্তি পুরুষকে দর্শন করেন তখন তিনি সকল পাপ-পুণ্যের ঊর্দ্ধে উঠেন, এই মরজীবনের কোন দোষ-গ্লানি আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি পরম সমতা লাভ করেন,

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি

—মুণ্ডক, ৩।১।৩

সংসারের সকল পাপ ও কলুষতার নিবৃত্তি এবং এই পরম সাম্যাবস্থাই প্রকৃত নির্ব্বাণ—আত্মার দর্শন লাভ করিয়াই এই নির্ব্বাণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেজন্য সাধনার প্রয়োজন—সাধনার দ্বারা ক্রমশঃ সকল

দ্বিধা ও সংশয় দূর হয়, সকল পাপ ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখনই সংযমী পুরুষ আত্মার দর্শন লাভ করেন,

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সত্যজ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥

—মুণ্ডক, ৩।১।৫

"এই আত্মাকে সর্ব্বদা সাধনার দ্বারা লাভ করিতে হয়; সত্য ও সংযমের দ্বারা পূর্ণ জ্ঞান ও দিব্যভাবে জীবন যাপনের দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায়, কারণ শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় আত্মা আভ্যন্তরীণ দেহের মধ্যে বাস করেন, সাধকগণের মানবীয় দোষসকল ক্ষীণ হইলে তাঁহারা সেই আত্মাকে দর্শন করেন।"

আত্মজ্ঞানের দ্বারা সকল পাপ ক্ষয় হয়, আবার সকল পাপ ক্ষয় না হইলেও পূর্ণ আত্মজ্ঞান—আত্মদর্শন লাভ হয় না। গুরুমুখে ও শাস্ত্রবচন হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হয়, সেই তত্ত্ব-সম্বন্ধে চিন্তা ও ধ্যান করিতে হয়, ক্রমশঃ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি পূর্ণ হয়—বেদান্ত তাই মোক্ষলাভের সাধনা বর্ণনা করিয়াছে—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ইহা জ্ঞানযোগের সাধনা। বৌদ্ধগণও অনুরূপ সাধনার অনুসরণ করেন—শ্রুতিময় জ্ঞান, চিন্তাময় জ্ঞান এবং শেষে ভাবময় দর্শন। এই ভাবময় দর্শন হইতেই মানবজীবনের সকল পাপ ও কলুষ সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় হইয়া যায়। গীতা এই জ্ঞানযোগের নির্দ্দেশ দিয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে কর্ম্মেরও উপদেশ দিয়াছে। এই শ্লোকেই বলা হইয়াছে, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়ে যখন আত্মদর্শন লাভ হয় তখন সব পাপ ও সংশয় সমূলে বিনষ্ট হয়, সাধক এই মর দেহেই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন; তাহাই নির্ব্বাণ, তাহাই পরম আনন্দ, অমৃতত্ব। উপনিষদে অন্যত্র এই কথাই বলা হইয়াছে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

—মুণ্ডক, ২।২।৯

"যখন মানুষ সেই পরাবর (যিনি উর্দ্ধের সত্তা এবং এই নিম্নতর সত্তা উভয়ই) ব্রহ্মকে দর্শন করে তখন হৃদয়ের গ্রন্থিসকল ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তাহার সকল সংশয় বিনষ্ট হয়, তাহার সকল কর্ম্মবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কাম্য যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথো মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমুশ্নুত ইতি ॥
—বৃহদারণ্যক ৪। ৪। ৭; কঠ ২। ৩। ১৪

"এই (মানব) হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা আশ্রিত রহিয়াছে, যখন সেই সমুদয় কামনা সমূলে বিচ্যুত হয়, তখন মর্ত্ত্য মানব অমৃত হন, তখন তিনি এই স্থানে, এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রহ্ম উপভোগ করেন।"

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহগ্রন্থয়ঃ।
অথো মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ —কঠ ২।৩।১৫

"এখানে এই মানবজন্মেই যখন হৃদয়ের (রাগদ্বেষ ও অহংমমাদি) গ্রন্থি-সমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর মানব অমর হয়; ইহাই হইতেছে সমগ্র শাস্ত্রের শিক্ষা।"

সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। গীতা অন্তর্মুখী হইয়া আত্মজ্ঞানলাভের দ্বারা ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভের কথা যে ভাবে বলিয়াছে তাহাতে মনে হইতে পারে যে, গীতা সংসারত্যাগী কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীরই প্রশংসা করিতেছে। এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য গীতা বলিল, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। শুধু জীবনধারণের জন্য যতটুকু কর্ম্ম সন্ন্যাসীরা রাখিতে বলেন কেবল তাহাই নহে, অথবা শুধু পূজা, ধ্যান প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মও নহে, পরন্তু সর্ব্বভূতের হিতসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্মে রত থাকিয়াই সাধক ব্রহ্মলাভের যোগ্য হইয়া উঠে এবং ব্রহ্মে নির্ব্বাণলাভের পরও সে সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকে—ইহাই গীতার সুস্পষ্ট শিক্ষা। কিন্তু এই শিক্ষা সন্ন্যাসবাদের অনুকূল নহে, তাই শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যে সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অহিংসা। গীতা যেখানে বিরাট কর্ম্মের বিধি দিয়াছে শঙ্কর সেটিকে কেবল একটি নিষেধে পরিণত করিয়াছেন—কাহারও হিংসা করিও না।

ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই অহিংসার নীতি ও আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। কাহারও অনিষ্ট না করা অতি উচ্চ আদর্শ এবং মানবীয় সভ্যতার উৎকর্ষের লক্ষণ—কিন্তু এমন যে পরম ধর্ম্ম অহিংসা, মানুষের অজ্ঞানের ফলে ইহাও কেমন করিয়া অধর্ম্মে পরিণত হয় ভারতেই তাহার নিদর্শন দেখা গিয়াছে। হিংসাকে প্রশ্রয় দিলে মানুষ কেমন নৃশংস হইয়া উঠে আধুনিক যুদ্ধে

আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি। নিঃসহায় নিরস্ত্র জনগণকে বিনা দোষে দলে দলে হত্যা করা হইতেছে, এমন কি শিশু, রুগ্ন, স্ত্রীলোকরাও রক্ষা পাইতেছে না, তাহাদের উপর মর্ম্মন্তুদ অত্যাচার করা হইতেছে, তাহাদিগকেও অতি নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করা হইতেছে—হিংসার ভাব দমিত না হওয়ায় মানুষ অসুর ও রাক্ষসের ন্যায় রক্তপাতে পৈশাচিক আনন্দ পাইতেছে! অন্যপক্ষে অহিংসা মন্ত্র জপিয়া প্রতিকার-বিমুখ হইলে এই সব আসুরিক মানবের অত্যাচার বাড়িয়াই উঠিবে, এই পৃথিবী মানববাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে—অথচ ভারতে আজও সেই অহিংসামন্ত্র প্রচারিত হইতেছে, ইহার জন্য বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় এবং পরে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সন্ন্যাসিগণই দায়ী। অধুনা পাশ্চাত্য দেশ হইতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের শিক্ষা আসিয়া এই প্রতিকার-বিমুখতায় ইন্ধন জোগাইতেছে। যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষা—"কেহ তোমার এক গালে চড় মারিলে তাহার দিকে অন্য গালটি ফিরাইয়া দিবে।" খ্রীষ্টান ইউরোপ এই শিক্ষা বর্জ্জন করিয়াছে, কারণ সমাজে এই শিক্ষা অনুসরণ করিলে লৌকিক ব্যাপার অচল হইয়া পড়ে। জার্ম্মান দার্শনিক নীট্‌শে বলিযাছেন, অহিংসার এই ধর্ম্মতত্ত্ব দাসত্বের ধর্ম্মতত্ত্ব ও ঘাতক-ধর্ম্মতত্ত্ব, এবং এই ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলে জাতি নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশ বহুদিনের তামসিকতায় একেই নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে—ইহার উপরে মহাত্মা গান্ধী আবার অতি জোরের সহিত এই খ্রীষ্টীয় অহিংসাতত্ত্ব ভারতে প্রচার করিতেছেন। অন্যপক্ষে রাজসিক ইউরোপে অহিংসা ঘাতক-ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়া প্রচারিত হওয়ায় জার্ম্মান জাতি রক্তপিপাসু অসুরের ধর্ম্মকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ফলে জগৎব্যাপী ধ্বংসলীলার সূচনা হইয়াছে।

এ-বিষয়ে প্রকৃত সমাধান কি? কেহ কেহ বলেন, সম্পূর্ণভাবে অহিংসা কেবল সন্ন্যাস আশ্রমেই সম্ভব। সমাজে গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিতে হইলে আততায়ী ও অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহার প্রতি প্রয়োজন হইলে বল প্রয়োগ করিতেই হইবে তাহাতে কোন পাপ হয় না। এ-বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের বিধানে কোনরূপ সন্দেহের স্থান নাই। গৃহস্থ এইরূপ প্রসঙ্গে দুষ্টের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে পরম ভক্ত প্রহ্লাদ সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন

তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপবাদিতা।

—(মহাভারত, বন, ২৮।৮)।

—এই জন্যই পণ্ডিতগণ সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষমা করা নিন্দা করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে পৃথুরাজা বলিয়াছেন,

একস্মিন্ যত্র নিধনং প্রাপিতে দুষ্টকারিণি।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ॥ —১।১৩।৭৩

—"যেখানে একজন নিধন প্রাপ্ত হইলে অনেকের রক্ষা হয়, সেখানে সেই একেরই বধ পুণ্যপ্রদ।" মনুসংহিতায় বিধান আছে—"যদি কেহ তোমাকে বধ করিতে আইসে, সে ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাকে হত্যা করিলে তোমার কোন পাপই হইবে না।" মনু, ৮।৩৫০

আর হিন্দুধর্ম্মের মূল উৎস বেদেও আমরা বলপ্রয়োগে শত্রুনিরোধের আদর্শ দেখিতে পাই। বিশ্বের মূলে যে শক্তি রহিয়াছেন তিনিই মানুষের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধের প্রেরণা দেন—

"অহং রুদ্রায় ধনুষা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ॥

ঋগ্বেদ—১০।১২৫।৬

"(ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপিণী) আমি ব্রাহ্মণদ্বেষিগণকে সংহার করিবার জন্য রুদ্রের ধনুতে জ্যা আরোপ করি, আমি জনসকলকে বলদৃপ্ত করি, আমার দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত।"

রামাযণ, মহাভারত এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধের কাহিনীতে পূর্ণ। গীতাতে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, দুষ্ট জনকে বিনাশ করিবার জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। অন্যপক্ষে অহিংসার আদর্শও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। প্রথমে ছান্দোগ্য উপনিষদেই অহিংসাব স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়—

অথ যত্তপো দানমার্জ্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।

৩।১৭।৪

গীতাও অনুরূপ ভাবে অহিংসাব প্রশংসা কবিয়াছে। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে, "ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেৎ"—ক্রুদ্ধ ব্যক্তির উপর উল্টা ক্রোধ করিবে না (মনু, ৬।৪৮)। মহাভারতে বলা হইয়াছে—

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্॥

মহাভারত, উদ্যোগ ৩৮।৭৩,৭৪

"(অন্যের) ক্রোধ নিজ শান্তভাবের দ্বারা জয় করিবে, দুষ্টকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কদাচারীকে দানের দ্বারা জয় করিবে এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে।" বৌদ্ধধর্ম্মীয় নীতিগ্রন্থে পালিভাষায় এই শ্লোকটি অবিকল অনুবাদ করা হইয়াছে,

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিষং দানেন সচ্চেনালীকবাদিনং ॥—ধম্মপদ, ২৩৩।

ইহা যে অতি উচ্চ নৈতিক আদর্শ তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল মনুষ্যেরই এই আদর্শ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে দুষ্ট আততায়ীকে বলপ্রয়োগ ব্যতীত নিবারণ করা যায় না সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা কি অবশ্যকর্ত্তব্য নহে? আধুনিক অহিংসাবাদীরা বলেন, আততায়ীকে আঘাত না করিয়া আমরা যদি স্বেচ্ছায় তাহার আঘাত নিজদের মাথা পাতিয়া লই, তাহাকে যন্ত্রণা না দিয়া তাহার সম্মুখে যন্ত্রণা ভোগ করি—তাহা হইলেই তাহার হৃদয় গলিয়া যাইবে—সে হিংসার পথ বর্জ্জন করিবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায়, এই নীতি সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হয় না। মানুষ স্বার্থবুদ্ধির বশে, অথবা কাম-ক্রোধের উত্তেজনায় অথবা কোন বিকৃত আদর্শবাদের প্রেরণায় এমন নিষ্ঠুর হইয়া উঠে যে, কোনরূপ নৃশংসতা বা নির্য্যাতন করিতে তাহাদের হৃদয় বা হস্ত এতটুকুও কম্পিত হয় না, হৃদয় বিগলিত হওয়া ত দূরের কথা। পিতামাতার চক্ষুর সম্মুখে যাহারা শিশু ও বালককে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের সম্মুখে সত্যাগ্রহ করিয়া কি ফল হইবে? নিঃসহায় নিরস্ত্র বন্দীগণকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া বেয়নেটের খোঁচায় অকথ্য যন্ত্রণা দিয়া বধ করিয়া যাহারা পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে তাহাদের সম্মুখে নিজেকে বলিদান দিতে যাওয়া বৃথা আত্মহত্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহার দ্বারা তাহাদিগকে সংশোধন করা বা নিবারণ করা অসম্ভব। একমাত্র বল প্রয়োগেই তাহাদিগকে নিবারণ করা যায় এবং তাহা না করিলে ব্যাপক হিংসা ও নৃশংসতাকে অবাধে কার্য্য করিতে দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব করিয়াছেন, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে যে কলহ বিবাদ হয়, যুদ্ধের দ্বারা তাহার প্রতিকার এপর্য্যন্ত হয় নাই, হইতেও পারে না—অতএব মানুষকে যত নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা সহিতে হউক না কেন, অহিংস পন্থা অবলম্বন করা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে বহু ক্ষেত্রে অহিংস প্রতিরোধ অবলম্বিত হইয়াছে,

তাহাতেও জগৎ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যায় নাই। মানুষ স্বভাবতঃই ন্যায় ও সত্যের অনুসরণ করিতে চায়, কোন্‌টা ন্যায় ও সত্য তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তাহারা সেই পন্থা অবলম্বন করিবে—এইরূপ ধারণার বশেই মহাত্মা গান্ধীর মত লোক অহিংস পন্থার উপদেশ দেন। কিন্তু বস্তুতঃ মানব-প্রকৃতি এত উন্নত নহে, তাহার মধ্যে এখনও অনেক অজ্ঞান ও বিকৃতি বহিয়াছে; সে-সব দূব করিতে না পারিলে তাহাদিগকে শুধু ন্যায় ও সত্যের পথ দেখাইয়া দিলে কোন ফলই হইবে না—চোবা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। যুদ্ধের দ্বারাই যুদ্ধ বন্ধ হইবে না ইহা সত্য,চাই মানব-প্রকৃতির আমূল রূপান্তর। কিন্তু হিংসাপরায়ণ অত্যাচারী ব্যক্তিগণকে যদি বলপূর্ব্বক দমন না করা যায় তাহা হইলে সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে, মানুষ অধ্যাত্ম সাধনার অনুকূল পরিস্থিতি পাইবে না, অতএব ভবিষ্যতে চিবদিনের জন্য মানবসমাজ হইতে হিংসা ও যুদ্ধ বিগ্রহ উঠাইয়া দিবার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বর্ত্তমানে যুদ্ধেব দ্বারাই বিরোধী শক্তিসকলকে দমন করিতে হইবে। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মযুদ্ধ প্রশংসিত হইয়াছে।

কিন্তু ধর্ম্মপক্ষেই হউক আর অধর্ম্ম পক্ষেই হউক যুদ্ধ, নরহত্যা ও রক্তপাত কবিলে কি মানুষেব নৈতিক অধঃপতন হইবে না? সকল মানুষের মধ্যেই ভগবান বহিয়াছেন, মূল সত্তায় সকল মানুষই এক—ইহাই আধ্যাত্মিকতার সাব কথা। যুদ্ধ ও রক্তপাত কি এই অধ্যাত্ম আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী নহে? সর্ব্বভূতের হিতসাধন করিয়াই যদি অধ্যাত্মজীবন লাভ করা যায়, তাহা হইলে যুদ্ধে বহু লোকের প্রাণবধ করিয়া কেমন করিয়া সে জীবন লব্ধ হইবে? বিষ্ণু-পুরাণে বলা হইয়াছে, "অন্য কোন প্রাণীবও হিংসা করিলে বিষ্ণুব হিংসা করা হয়, কারণ সেই বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়" (৩৮।১০)। তাই ভাবতের হিন্দুগণ জীব-হত্যাকে মহাপাপ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। অথচ এই পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতে হইলে, সমাজ ও সভ্যতা রক্ষা করিতে হইলে জীবহত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ অপরিহার্য্য। এই সমস্যার দুই রকম সমাধান দেখা যায়। প্রথম, হিংসা যখন পাপ তখন কোন কারণেই তাহা করা উচিত নহে; হিংসাবর্জ্জন করিলে আপাততঃ ক্ষতি হইলেও পরিণামে তাহার ফল ভাল হইবেই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—হিংসা যেমন পাপ, ক্ষেত্রবিশেষে হিংসা না করাও কম পাপ নহে, কারণ একজন আততায়ীকে বধ করিয়া আমি যদি

শতজন লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে পারি, তাহা না করিলে আমাকে ঐ শতজন লোকের প্রাণনাশরূপ পাপের ভাগী হইতে হয়। দ্বিতীয় সমাধান হইতেছে এই যে, হিংসা পাপ হইলেও মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় যখন উহা অপরিহার্য্য তখন উহাকে যতদূর সম্ভব কম করিতে হইবে—আর যাঁহারা সম্পূর্ণ অহিংস হইয়া অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগকে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণে আমরা এইরূপ সমাধানই পাই—সেখানে সম্পূর্ণ অহিংসা এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধন চতুর্থ আশ্রমের জন্যই ব্যবস্থিত হইযাছে,

ত্রৈবর্গিকাংস্ত্যজেৎ সর্ব্বানারম্ভানবনীপতে।
মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষ্বেব জন্তুষু॥
জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ ক্বচিৎ।
যুক্তঃ কুর্ব্বীত ন দ্রোহং সর্ব্বসংঙ্গাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
—বিষ্ণুপুরাণ ৩।৯।২৬-২৭

—"হে অবনীপতে!" ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) ধর্ম্ম অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন সমুদায় যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন এবং শত্রু, মিত্র ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় প্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন। বাক্য, মন বা কর্ম্মদ্বারা জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্ব্বদা যোগরত থাকিবেন এবং সকল আসক্তি বর্জ্জন করিবেন।"

শঙ্করাদি ভাষ্যকারগণ "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" বলিতে এইরূপ চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাসিগণকেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু ইহা আদৌ গীতার শিক্ষা নহে—গীতা স্পষ্ট বলিয়াছে যে, সন্ন্যাসী বা যোগী হইতে হইলে সংসার বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় না, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম কখনই ত্যাজ্য নহে, অনাসক্ত ভাবে যে-ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত যোগী (৬।১)। উপনিষদে অহিংসার যে বিধি আছে মীমাংসকগণ তাহার এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যজ্ঞার্থে যে হিংসা করা হয় না অথবা যাহা শাস্ত্রবিগর্হিত তাহাই পাপ ও বর্জ্জনীয়। গীতাও বলিয়াছে,

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। ৩।৯

হিংসা বা অহিংসা যে কোন কর্ম্মই অহং-বুদ্ধিতে আসক্তি ও বাসনার বশে

না করিয়া যদি ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে করা হয় তাহাতে পাপ বা বন্ধন হয় না। ইহাই হইতেছে গীতার সমাধান,

তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।

সন্ন্যাসিগণ যে সকল প্রকার কর্ম্ম ও হিংসা বর্জ্জন করিবার উপদেশ দেন তাহা কার্য্যতঃ সম্ভব নহে, আর সেই অসম্ভব প্রয়াস করিতে গেলে শরীর রক্ষা হইবে না। জীবহিংসা ব্যতীত মানুষ এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারে না, প্রতি নিঃশ্বাসে আমরা কোটি কোটি জীবকে হত্যা করিতেছি—ইহা বন্ধ হইলে জীবনেরই শেষ হইবে।

শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানুষের আত্মবিকাশের জন্য এক অবস্থায় প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহা দ্বারা জীবন ও কর্ম্ম-সমস্যার চরম সমাধান হয় না। মানুষ এখন যে মানসচৈতন্যের মধ্যে বাস করিতেছে ইহার স্বরূপই হইতেছে অজ্ঞান, ইহা সকল সত্যকেই আংশিক ভাবে দেখে এবং এইভাবে সত্যকে অসত্যে, ধর্ম্মকে অধর্ম্মে পরিণত করিবার সম্ভাবনা ইহার মধ্যে রহিয়াছে। অহিংসা, জীবে দয়া পরম সত্য ও পরম ধর্ম্ম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-সেবন,
ইহা বই ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন।"

কিন্তু এই ধর্ম্মেরও অতিমাত্রায় মানুষ মানুষের জীবনের ক্ষতি করিয়া কীটপতঙ্গের, পশুপক্ষীর সেবা করিতে উদ্যত হয়। জৈনধর্ম্ম ইহার নিদর্শন। জৈন সাধকরা সর্ব্বদা নাকে একটী কাপড় বাঁধিয়া রাখেন যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কোন জীবহানি না হয়, এইভাবে তাঁহারা একটি পরম সত্য ও ধর্ম্মকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। আবার যাহারা অহিংসার নামে আত্মরক্ষা, দেশরক্ষায় বলপ্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন—তাঁহারা অত্যাচারীর অত্যাচারকেই প্রশ্রয় দিয়া মানবসমাজের অশেষ অহিতসাধন করিতেছেন।* আত্মরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করিলে কোন পাপ হয় না ইহা শাস্ত্রেরই

* কথিত আছে সেনাপতি সিংহ দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা অন্যায় কি না বুদ্ধকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ উত্তর দিয়াছিলেন—"যে শাস্তির যোগ্য তাহাকে শাস্তি দিতেই হইবে··· তথাগতের শিক্ষা ইহা নহে যে যাহারা শান্তিরক্ষার জন্য সকল চেষ্টায় বিফল হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তাহারা দোষের ভাগী হয়।"

বিধান। মনু বলিয়াছেন, আত্মানং সততং রক্ষেৎ। মহাভারতে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়াছেন,

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

(মহাভারত, আদি, ১১৫।৩৬)

লোকমান্য তিলক এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "আত্ম শব্দ সাধারণ সর্ব্বনাম, ইহা হইতে আত্মসংরক্ষণের এই তত্ত্ব এক ব্যক্তিরই ন্যায় সমবেত লোকসমূহের প্রতি, জাতির প্রতি, দেশের প্রতি কিংবা রাষ্ট্রেরও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।" কিন্তু আবার এই "আত্ম"রক্ষার নীতিই কিরূপ দুষ্ট নীতিতে পরিণত হইতে পারে আধুনিক জার্ম্মান জাতি তাহার সুন্দর নিদর্শন। তাহাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সব কিছুরই মূলে রহিয়াছে জগতে জার্ম্মাণ জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাহাদের মতে অ-শ্বেত জাতিসমূহ শ্বেত-জাতির অধীনে কুলী মজুরের কার্য্য করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইতেছে সৃষ্টিকর্ত্তার বিরুদ্ধে মহাপাপ —এ-কথা হিট্লার তাঁহার Mein Kampf গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। আর শ্বেতজাতির মধ্যে জার্ম্মাণ জাতিই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহারা সংখ্যায় যত বর্দ্ধিত হইবে ততই জগতের পক্ষে কল্যাণকর—অতএব তাহাদের স্থান (Lebensraum) করিবার জন্য অন্য দেশ দখল করিয়া লওয়া, অন্য জাতিকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দেওয়া—ইহাই হইতেছে ভগবানের অভিপ্রেত, ইহাতেই সর্ব্বভূতের প্রকৃত হিত সাধিত হইবে। বহুদিন হইতে জার্ম্মাণ জাতিকে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই তাহারা গত মহাযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধেরও অবতারণা করিয়াছে —এবং যে ভাবে তাহারা লক্ষ লক্ষ অ-সামরিক নরনারীকে হত্যা করিতেছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অসুর ও রাক্ষস শক্তি তাহাদের উপর ভর করিয়াছে। অহং ও হিংসাকে প্রশ্রয় দিলে শেষ পর্য্যন্ত তাহা কোথায় দাঁড়ায়, জার্ম্মাণ জাতি হইতেছে আধুনিক জগতে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অতএব হিংসার নীতি ও অহিংসার নীতি দুই-ই ক্ষেত্রবিশেষে উপযোগী ও সমর্থনযোগ্য হইলেও এই সব বাহ্য নীতির দ্বারা মানবজীবনের সমস্যা-সমূহের চরম সমাধান হইবে না। আর চরম সমাধান দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্য

হওয়ায় গীতা উভয়েরই উর্দ্ধে উঠিতে বলিয়াছে, উভে সুকৃত দুষ্কৃতে, এবং মানুষ কেমন করিয়া সেই উচ্চতর অধ্যাত্ম অবস্থায় উঠিতে পারে তাহার ক্রমিক সাধনা দেখাইয়া দিয়াছে। গীতা যে অহিংসার শিক্ষা দিয়াছে তাহার কোথাও ব্যতিক্রম নাই—গীতা কোন অবস্থাতেই হিংসার সমর্থন করে নাই, হিংসার উপদেশ দেয় নাই, স্পষ্টভাবে জাতিধর্ম্ম শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বভূতের হিত সাধন করিতে বলিয়াছে। কিন্তু যেমন অন্যান্য বিষয়ে, তেমনই হিংসা ও অহিংসা বলিতে গীতা বাহিরের কোন কর্ম্ম বুঝে নাই—ভিতরের আভ্যন্তরীণ ভাবই বুঝিয়াছে।* কাহারও প্রতি কোন অবস্থায় হিংসার ভাব, বৈরভাব পোষণ করিবে না ইহাই গীতার শিক্ষা, নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু। কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে প্রয়োজন হইলে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবে না, কাহাকেও আঘাত বা বধ করিবে না। যুদ্ধ করিবে হিংসার বশে নহে, বৈরভাব লইয়া নহে, পরন্তু কর্ত্তব্যের প্রেরণায়। ইহাই প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়,—যুদ্ধ তাঁহার কর্ত্তব্য—তিনি যুদ্ধে রক্তপাত করিলে তাঁহার পাপ হইবে না, বরঞ্চ তাহা না করিলে পাপ হইবে,

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ২।৩৩

কিন্তু ইহাতেও চরম সমাধান হয় না—কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিলে পাপ হয় না বুঝিলাম, কিন্তু কোন্‌টা আমার কর্ত্তব্য তাহা আমি নিঃসংশয়ে বুঝিব কেমন করিয়া? যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, কিন্তু জ্ঞাতিহত্যা, গুরুহত্যা-রূপ মহাপাপ কি কাহারও কর্ত্তব্য হইতে পারে? এ-সংশয় আমার মনে উঠিলে তাহার সমাধান কেমন করিয়া হইবে? আমার মনে যদি হয় যে, কোন একটা কর্ম্ম পাপ তাহা হইলে সেটি করিবার কর্ত্তব্যবোধ আমার কেমন করিয়া আসিবে? অন্য পক্ষে দেখা যায় মানুষ অতি বড় অন্যায় কর্ম্মও কর্ত্তব্য বোধ লইয়া করে—ইহুদী জাতিকে, পোল জাতিকে নির্ম্মূল করিয়া জর্ম্মাণ জাতির বর্দ্ধনের ব্যবস্থা করাই হিটলার তাঁহার পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিতেছেন। বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে যতক্ষণ অহংভাব আছে ততক্ষণ সে

* যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৮।১৭

ঠিক ভাবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে না—এই অবস্থায় শাস্ত্র কতকটা সহায় হইতে পারে। গীতা সে উপদেশ দিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছে—শাস্ত্রবিধিকেও ছাড়াইয়া যাইতে হইতে পারে, শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য। প্রকৃত সমাধান মিলিবে যখন মানুষ তাহার মধ্যে অহংভাব ও কামক্রোধ সম্পূর্ণভাবে দূর করিয়া দিবে। এই জন্যই গীতা পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিতে নির্ব্বাণ-তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছে, এমন কি রাজযোগেরও উপদেশ দিয়াছে। যখন আমরা বাসনা কামনার বশ্যতা হইতে এবং তাহাদের মূল অহংভাব হইতে মুক্ত হইব, সর্ব্বভূতের সহিত আমাদের একত্ব উপলব্ধি করিব, তখনই ভগবানের ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা এক হইবে, কেবল তখনই আমাদের সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া নির্ব্বিশেষে সর্ব্বভূতের হিত সাধিত হইবে, এবং ইহাই গীতার আদর্শ। আততায়ীকে বধ করিলেই যে তাহার অহিত বা অনিষ্ট করা হয়, তাহা নহে। গীতা দেহের জীবনকে বড় স্থান দেয় নাই, আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্তা। অধ্যাত্মজীবনবিকাশের পথে এই দেহটা যদি বিঘ্নস্বরূপ হয় তবে ইহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। আততায়ীকে বধ করিয়া যদি তাহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা যায় তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া তাহার কল্যাণই সাধন করা হয়—ভগবান এই ভাব লইয়াই দুষ্কৃতগণের বিনাশ সাধন করেন, পরন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার হিংসা বা বৈরভাব নাই—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। ৯।২৯

সর্ব্বভূতের প্রতিই তাঁহার সমভাব, কাহারও প্রতি তাহার কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব নাই। তথাপি জগৎকে তাহার লক্ষ্যের দিকে লইবার জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি ধ্বংসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকসকলকে সংহার করেন, কালোঽহং লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃত্তঃ। একদিকে তিনি রুদ্র, ধ্বংসরূপী মহাকাল, অন্যদিকে তিনিই আবার সর্ব্বভূতের সুহৃদ; ধ্বংসের ভিতর দিয়া, মৃত্যুর ভিতর দিয়া, সকল সুখদুঃখ, শোকতাপের ভিতর দিয়া তিনি সকলকেই অমৃতত্বের পরম শান্তি ও আনন্দের দিকে লইয়া যাইতেছেন। আমাদিগকেও এই ভাব লাভ করিতে হইবে, আত্মায় ভগবানের সহিত ও সর্ব্বভূতের সহিত এক হইতে হইবে, আর আমাদের বাহ্যপ্রকৃতিকে, দেহ, প্রাণ, মনকে জগতে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদনের যন্ত্র, নিমিত্ত করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ইহা

সহজে হয় না, ইহার জন্য অনেক সাধনার প্রযোজন। সাধনার দ্বারা প্রথমে ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে আমাদের অহংভাবের নির্ব্বাণ করিতে হইবে—তবেই আমরা আত্মায় সর্ব্বভূতের সহিত এক হইতে পারিব, প্রকৃতভাবে সর্ব্বভূতের হিতসাধন করিতে পারিব। পাশ্চাত্য কর্ম্মীর ন্যায় গীতার কর্ম্মযোগী দেশের হিত, সমাজের হিত, মানবজাতির হিত এমন কোন কামনা লইয়া কর্ম্ম করেন না, পরিবার, জাতি, দেশ, কাহারও প্রতি তাঁহার কোনরূপ কর্ত্তব্য বা দায়িত্বের বন্ধন নাই—তিনি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত। এই সব আংশিক সত্যের উপর যে চরম সত্য, আত্মার সত্য, ভগবানের সত্য—তিনি সেই সত্যের আলোকে জীবনযাপন করেন, তাঁহার সম্বন্ধ শুধু ভগবানের সহিত, কর্ত্তব্য শুধু ভগবানের প্রতি, দায়িত্ব শুধু ভগবানের নিকট—ভগবানের ইচ্ছা পালন ছাড়া তাঁহার জীবনের, তাঁহার কর্ম্মের আর কোন নীতি নাই। আর তিনি সকল অহংভাব ও বাসনা হইতে, কামক্রোধ আসক্তি হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বলিয়া তিনি তাঁহার অহংভাবাত্মক বাসনা কামনাকেই ভগবানের ইচ্ছা বলিয়া ভুল করেন না, তিনি অজ্ঞান অপূর্ণ মনবুদ্ধির যুক্তিতর্কের দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন না—তিনি শুধু নিজেকে ঊর্দ্ধের দিকে খুলিয়া রাখেন—ভাগবত শক্তি তাঁহার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়, তাঁহার কর্ম্ম সুচারুভাবে সম্পাদন করিয়া দেয়, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বভূতের যথার্থ হিত সাধন করে।

কিন্তু যতক্ষণ মানুষ এই মুক্ত অবস্থা লাভ না করিতেছে, এইভাবে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত না হইতেছে ততক্ষণ তাহাকে কোন আংশিক সত্যকে স্বীকার করিয়াই চলিতে হইবে—নিজের ব্যক্তিগত বাসনা কামনা স্বার্থকে কোন মহত্তর জিনিষের অধীন করিয়া দিতে হইবে, পরিবার, দেশ, মানবজাতি এইরূপ কোন আদর্শের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহার আত্মবিকাশ যেমন বর্দ্ধিত হইবে, সকল বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইবে—কিন্তু এই মুক্তি তাহাকে সর্ব্বভূত হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবে না, কারণ সে সর্ব্বভূতের সহিত মূল সত্তায় নিজের ঐক্য উপলব্ধি করিবে—যতক্ষণ না সকল মানব তাহার ন্যায় মুক্ত হইতেছে ততক্ষণ তাহার নিজের মুক্তি হইল না বলিয়াই সে অনুভব করিবে। সেইজন্য নিজে মুক্তি লাভ করিয়া সে সর্ব্বভূতের হিত সাধনে ব্যাপৃত থাকিবে—ইহাই গীতার শিক্ষা।

বুদ্ধ নির্ব্বাণের পথ আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু নির্ব্বাণের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলেন সকল মানবকে সেই পথ দেখাইয়া দিবার জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ একদিকে নির্ব্বাণের মহান আহ্বান শুনিলেন, অন্যদিকে মানবের দুঃখে বিশেষতঃ দীনহীনদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিল, তিনি সকলের সহিত নিজ একত্ব অনুভব করিয়া সকলের সেবায় নিজকে নিযুক্ত করিলেন। ইহাই গীতার কর্ম্মযোগের আদর্শ,—ভিতরে নির্ব্বাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাহিরে অতন্দ্রিতভাবে সর্ব্বভূতের হিতসাধন।

মানবজাতি এখন উপলব্ধি করিতেছে যে, দেশের সেবা, জাতির সেবা 'এই সব আদর্শ যথেষ্ট নহে। গত ইউরোপীয় যুদ্ধে জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মিস্ ক্যাভেল শেষ মুহূর্ত্তে বলিয়াছিলেন, "Patriotism is not enough"—দেশপ্রেমই যথেষ্ট নহে। আজ ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে ও বিজ্ঞানের কল্যাণে সমগ্র মানবজাতি এক পরিবারে পরিণত হইয়াছে, এখন মানবসমাজের নূতন তন্ত্র স্থাপন করিতে হইলে চাই সকল মানুষের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য বোধ, কিন্তু ইহা কোন মানসিক বা নৈতিক আদর্শ হইলে চলিবে না, গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গীতা মানবজাতির সম্মুখে সেই আদর্শই ধরিয়াছিল, তাহারও বহু পূর্ব্বে ঋগ্বেদে এই আদর্শ প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

অন্বয়। কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং যতীনাম্ অভিতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে।

অনুবাদ। যে-সকল যত্নশীল সাধক কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং আত্মজয় লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মনির্ব্বাণ তাঁহাদের চারিদিকে থাকে (তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণের মধ্যেই বাস করেন), কারণ তাঁহারা আত্মার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের উপর্য্যুপরি তিনটি শ্লোকে (২৪-২৬) নির্ব্বাণতত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছে। প্রথমেই বলা হইয়াছে, যে-যোগী নিজ অন্তরের মধ্যে সুখ, শান্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ

করেন (৫।২৪)। সাধারণ জীবনে আমরা "আমি" বলিয়া যাহা অনুভব করি তাহা আমাদের প্রকৃত সত্তা নহে, তাহা হইতেছে আমাদের দেহ, প্রাণ ও মন লইয়া গঠিত, প্রকৃতির তিন গুণের অধীন—সেখানে প্রকৃত আত্মজয় নাই, আত্মজ্ঞান নাই। এই "আমি" নিজেকে জগতের আর সব কিছু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করে এবং নিজের বাসনা কামনাব বশে কর্ম্ম করা হইতেছে ইহার নীতি। মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় সকলের প্রতি আসক্তিই হইতেছে এই "আমি" বা অহংয়ের গ্রন্থি। এই "আমি"র জীবন দুঃখ, দ্বন্দ্ব, অশান্তিতে পূর্ণ, ইহার মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান নাই, মুক্তি নাই—এখানে আমরা অবশভাবে প্রকৃতির তিন গুণেব দ্বাবা চালিত হই। কিন্তু আমাদের মধ্যে আর একটি উর্দ্ধতর সত্তা রহিয়াছে, তাহা আত্মা, অধ্যাত্ম সত্তা—জ্ঞান ও মুক্তি তাহাব অন্তর্নিহিত, তাহা আপনার জ্যোতিঃ, শান্তি, আনন্দে পূর্ণ। নীচের অহংয়েব প্রাকৃত জীবনকে ছাড়াইয়া উঠিয়া এই আত্মার চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—ইহাই সকল প্রাচীন অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য ছিল এবং গীতাও এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে আত্মাকে লাভ করার অর্থ হইতেছে, তখন আর আমবা ক্ষুদ্র অহং থাকি না, এই দেহ, প্রাণ ও মনের সীমাবদ্ধ জীবনকেই আমাদের সব সত্তা বলিয়া দেখি না, পরন্তু আমরা অনুভব করি যে, আমবা অজর অমর অনাদি অনন্ত আত্মা, এই এক আত্মাই সর্ব্বভূতের মধ্যে রহিয়াছে, এই আত্মাতেই সর্ব্বভূত রহিয়াছে—বস্তুতঃ এই আত্মাই ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। তখন আমরা "আমি" ছাড়াইয়া ব্রহ্ম হই, ব্রহ্মভূতঃ, আর এই যে ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে "আমি"ত্বের নির্ব্বাণ বা লয়—গীতা ইহাকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলিয়াছে। কিন্তু তখন কি আব এই দেহ, প্রাণ, মনের জীবন থাকিবে? তখন কি জীবচৈতন্য, জগৎচৈতন্য থাকিবে? প্রারব্ধের বশে যতদিন দেহটা থাকিবে ততদিন তাহার মধ্যে প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়া, আহার নিদ্রা ইত্যাদি চলিতে থাকিবে, কিন্তু আত্মজ্ঞানী পুরুষ আত্মচৈতন্যে সমাধিস্থ হইয়া থাকিবেন—দেহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সমস্ত খেলা শেষ হইয়া যাইবে, ব্রহ্মের মধ্যে জীবাত্মার সম্পূর্ণ লোপ হইবে—ইহাই মোক্ষ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু গীতা যে এই আদর্শ গ্রহণ কবে নাই পরের দুইটি শ্লোকে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। গীতা বলিয়াছে—যে সকল ঋষি পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সকল সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন

তাঁহারাই ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ কবেন। ইহা হইতে মনে হয় যে এইটিই নির্ব্বাণের অবস্থা, কিন্তু ইহা ত সাংসারিক জীবন ও কর্ম্মের বিলোপ নহে, ইহা শুধু পাপ ও অজ্ঞানেব বিলোপ এবং এই জ্ঞানময় ও বিশুদ্ধ প্রকৃতি লইয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধন। তবে যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, এইটি হইতেছে নির্ব্বাণেব সাধন, প্রকৃত নির্ব্বাণ নহে—যাঁহারা এইরূপ নিষ্পাপ ও সর্ব্বভূতহিতে রত তাঁহারাই নির্ব্বাণলাভের যোগ্য হইয়া উঠেন, নির্ব্বাণলাভেব পব আব তাঁহাদেব সংসার বা কর্ম্ম থাকে না, এইরূপ সন্দেহ নিরসন কবিবার জন্য গীতা পবেব শ্লোকেই (৫।২৫) স্পষ্ট করিযা বলিল যে, যে-সব নিষ্পাপ সাধক আত্মাকে জানিয়াছেন, নির্ব্বাণ তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান—এই সংসারেব মধ্যে থাকিয়াই তাঁহারা নির্ব্বাণের মধ্যে বাস কবেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে সংসার ও কর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে হয় না। গীতার মতে অহং ভাব ছাড়াইয়া উঠিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, ব্রহ্ম হওয়া—ইহাই নির্ব্বাণ, আত্মাকে জানিয়াই এইরূপ ব্রহ্ম হওয়া যায় এবং তখন সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয় না,—এই সমস্ত সংসার, সমস্ত জীব ও জগৎই ব্রহ্ম বলিয়া অনুভূত হয়। উপনিষদও বলিয়াছে—

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, তবতি শোকং, তরতি পাপ্মানং, গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥ (মুণ্ডক, ৩।২।৯)

—"যিনি সেই পরম ব্রহ্মকে বিদিত হন তিনি ব্রহ্মই হন, তাঁহার বংশে কোন অব্রহ্মবিৎ জন্মগ্রহণ কবে না। তিনি শোক অতিক্রম করেন, পাপ অতিক্রম করেন ; তিনি হৃদয়গ্রন্থিসমূহের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হন।"

অথো মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত

—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৭ ; কঠ, ২।৩।১৫

"তখন মর্ত্ত্য জীব অমৃত হন, তখন তিনি এই স্থানেই, এই দেহেই বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রহ্মকে উপভোগ করেন।"

কামক্রোধবিযুক্তানাং। অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করিতে হইবে—দিব্য জীবন ও দিব্য কর্ম্মের জন্য এইটিই হইতেছে প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু এইভাবে সকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের গণ্ডী

অতিক্রম করিয়া নির্ব্যক্তিক সত্তায় এবং সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয় না যতক্ষণ আমরা আমাদের অহংয়ের প্রতি এবং অহংয়ের সকল সম্বন্ধের প্রতি আসক্ত থাকি। অহংয়ের প্রধান চিহ্ন ও গ্রন্থি হইতেছে কাম অর্থাৎ বাসনা কামনা। বাসনার বশেই আমরা "আমি" "আমার" এইরূপ ভাব পোষণ করি, কিসে আমার এবং আমার আপন জন সকলের ভাল হইবে, ভোগসুখের বৃদ্ধি হইবে সর্ব্বদা সেই চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি, যাহা কিছু আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরোধী বলিয়া মনে হয় সেই সবের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হই, এবং এই দুরতিক্রম্য অহংভাব ও বাসনার জন্যই আমরা সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, জয় পরাজয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অধীন হই। কামনা সকল সময়েই আমাদের মনে বিভ্রম লইয়া আইসে, আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে, সকল জিনিষকে বিকৃতভাবে দেখায়, জ্ঞানকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া দেয় (৩।৩৯)। কামনা এবং ইহা হইতে উত্থিত ক্রোধাদি রিপু সকল হইতেছে সকল পাপ ও ভ্রান্তির মূল (৩।৩৭)। যতক্ষণ আমরা বাসনা কামনা পোষণ করি ততক্ষণ নির্ম্মল শান্তি, স্থির আলোক, শান্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান কিছুতেই সম্ভব হয় না। কামনা হইতেছে অধ্যাত্ম সত্তার বিকৃতি—যতক্ষণ আমরা ইহার অধীন থাকি আমরা অধ্যাত্ম সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি না, যথাযথ চিন্তা, যথাযথ কর্ম্ম, যথাযথ প্রেম ও ভক্তি সম্ভব হয় না। যে-কোন রূপে, যে-কোন অছিলায় কামনাকে থাকিতে দিলে তাহা বিজ্ঞতম ব্যক্তিরও চিরশত্রুরূপে বিরাজ করিবে, জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা, এবং মনকে যত্নলব্ধ দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হইতেও বিচ্যুত করিয়া দিবে (২।৬০)। বাসনা কামনাই হইতেছে অধ্যাত্ম সিদ্ধির প্রধান শত্রু।

অতএব গীতার বাণী হইতেছে—"কামকে বধ কর ; বাহ্য বস্তু যে ভোগ-সুখ আনয়ন করে তাহার প্রতি আসক্তি বর্জ্জন কর। বাহির হইতে যে-সব স্পর্শ বা আকর্ষণ আইসে, মন ও ইন্দ্রিয়ের ভোগের বস্তু রূপে আইসে, সে-সব হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখ। কামক্রোধাদি রিপুর বেগকে সহ্য করা এবং বর্জ্জন করা অভ্যাস কর, যদিই তাহারা তোমার দেহ, প্রাণ, মনে বিক্ষোভ উৎপাদন করে তখনও তোমার আভ্যন্তরীণ সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা অভ্যাস কর, নিজেকে সে-সব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা অভ্যাস কর, শেষে আর তাহারা তোমার প্রকৃতির কোন অংশকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না।

এই ভাবে সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ প্রভৃতির দ্বন্দ্ব সহ্য কর, প্রকৃতি হইতে ঘৃণা, বিদ্বেষ নির্ম্মূল করিয়া দাও। কামোপভোগের সকল বস্তুর প্রতি একটা শান্ত উদাসীন ভাব হউক।

এই ভাবে তুমি পাইবে পূর্ণতম সমতা এবং অবিচল স্থিরতার শক্তি, ব্রহ্ম যেমন প্রকৃতির বিচিত্র লীলার পশ্চাতে স্থির ও সমভাবে বিদ্যমান তুমিও সেই ভাব লাভ করিবে—কামক্রোধ হইতে বিযুক্ত জিতাত্মা যতচিত্ত হইবে। সমভাব লইয়া সব কিছুকে দেখ; যাহা কিছু তোমার কাছে আসে—জয় পরাজয়, মান অপমান, যশ নিন্দা, মানুষের ভালবাসা ও সমাদর অথবা ঘৃণা ও নির্য্যাতন, যে-কোন ঘটনা অপবের মধ্যে সুখের উদ্রেক করে বা দুঃখের উদ্রেক করে—সে-সবকে গ্রহণ কর হৃদয় ও মনে পূর্ণ সমতা লইয়া। সকল ব্যক্তির প্রতি, সাধু অসাধু, জ্ঞানী মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, শ্রেষ্ঠ মানব, ক্ষুদ্রতম জীব—সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখ। তোমার সহিত যাহার যে সম্বন্ধই থাকুক না কেন, শত্রু মিত্র, আত্মীয় পর সকলকে সমান ভাবে গ্রহণ কর। এ-সকল সম্বন্ধের কেন্দ্র হইতেছে অহং, আর তোমাকে হইতে হইবে অহং হইতে মুক্ত। এ-সব হইতেছে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, আর তোমাকে গভীর নির্ব্যক্তিক ভাব লইয়া সব কিছুকে দেখিতে হইবে। এ-সব ভেদ বাহ্যিক, সাময়িক—তুমি এই ভেদ দেখিবে কিন্তু ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইবে না; কারণ তোমাকে মন দিতে হইবে এই সব ভেদের উপরে নহে, পরন্তু যাহা সকলের মধ্যে এক, সকলে মূলতঃ যে এক আত্মা, সকল জীবের মধ্যে যে এক ভগবান রহিয়াছেন তাহার উপরেই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে, জগতের সকল বস্তু, সকল ঘটনার ভিতর দিয়া এক ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে, তাহারই উপর তোমার দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তখনও তোমার মধ্যে কর্ম্ম চলিবে, কারণ প্রকৃতির কর্ম্ম কখনই বন্ধ হয় না। কিন্তু তোমাকে অনুভব করিতে হইবে যে, তোমার আত্মা কর্ত্তা নহে; কেবল দেখিয়া যাও, অবিচলিত থাকিয়া দেখিয়া যাও প্রকৃতি তোমার মধ্যে কেমন সব কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছে, প্রকৃতির গুণসকল কিরূপ রহস্যময় ভাবে ক্রিয়া করিতেছে। নিজের মধ্যে এই ক্রিয়া দেখ; তোমার চতুর্দ্দিকে কি ক্রিয়া চলিতেছে দেখ এবং বুঝ যে অপরের মধ্যেও সেই একই ক্রিয়া চলিতেছে। দেখিবে তোমার বা তাহাদের কর্ম্মের পরিণাম অনেক সময়েই

এমন হইতেছে যাহা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর নাই বা আশা কর নাই—সে ফল নির্দ্ধারিত হইতেছে এক সর্ব্বজয়ী শক্তি দ্বারা। এমন কি তুমি যে কর্ম্মের সঙ্কল্প কর, তাহা বস্তুতঃ তোমার সঙ্কল্প নহে, তোমার অহংয়ের সঙ্কল্প, এবং সে অহং হইতেছে প্রকৃতিরই সৃষ্টি, তাহা তোমার প্রকৃত সত্তা নহে। তোমার এই বাহ্য প্রাকৃত সত্তা হইতে সরিয়া, তোমার নীরব নিশ্চল আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হও; তুমি দেখিতে পাইবে তুমি পুরুষ নিষ্ক্রিয়, পরন্তু প্রকৃতি সকল সময়েই তাহার গুণসকলের অনুসারে কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছে। এই আভ্যন্তরীণ নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হও; নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করিও না। প্রকৃতির খেলার ঊর্দ্ধে নিজের মধ্যে আসীন থাক, প্রকৃতির গুণসকলের বিক্ষুব্ধ ক্রিয়া হইতে মুক্ত থাক, নির্ব্যক্তিক অধ্যাত্মসত্তার কলুষ-হীনতার মধ্যে সুরক্ষিত হইয়া থাক, তোমার দেহ, প্রাণ, মনে যে-সব আবিল তরঙ্গ উঠিতেছে সে-সব যেন তোমাকে বিক্ষুব্ধ না করে।

যদি ইহা করিতে পার তাহা হইলে তুমি এক মহান মুক্তি, উদার স্বাধীনতা ও গভীর শান্তির মধ্যে উন্নীত হইবে। তখন তুমি ভগবানকে জানিতে পারিবে, অমৃত হইবে, দেহ, প্রাণ, মনের অতীত তোমার চিরন্তন আত্মসত্তাকে লাভ করিবে, তোমার অধ্যাত্মসত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া-সকল আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন তুমি তোমার সুখের জন্য, বাসনাতৃপ্তির জন্য কোন মর্ত্ত্য বা বাহ্য বা পার্থিব জিনিষের উপর নির্ভর করিবে না, পরন্তু শান্ত ও শাশ্বত আত্মার যে আপনাতে আপনি পূর্ণ আনন্দ তাহাই চিরতরে লাভ করিবে। তখন আর তুমি একটি মনোময় জীব থাকিবে না, তখন তুমি হইবে অনন্ত আত্মা, তখন তুমি হইবে ব্রহ্ম, ব্রহ্মভূতঃ।

যতীনাং যতচেতসাম্। গীতা পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ সাধনারই ইঙ্গিত দিয়াছে, এবং এইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে অহংভাবের লয় করিয়া ব্রহ্ম হওয়াকেই নির্ব্বাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। যাহারা যত্নের সহিত সাধনা করিয়া এইভাবে চেতনার রূপান্তর সাধন করে, যতীনাং যতচেতসাম্, নির্ব্বাণ তাহাদের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু এইরূপ সাধনা ও সিদ্ধিলাভ কি সংসারে থাকিয়া সম্ভব? শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ তাহা স্বীকার করেন না, তাই তাঁহারা "যতি" শব্দের অর্থ করিয়াছেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। কিন্তু এই অধ্যায়ের প্রথমে স্পষ্টই কর্ম্মযোগকে সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা

হইয়াছে; আবার ২৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে সর্ব্বভূতের হিতসাধনে রত থাকিয়াই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করা যায়। অতএব এখানে 'যতি' শব্দে যত্নশীল সাধকই বুঝিতে হইবে, সংসারত্যাগী কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী নহে। তবে সাধারণ সাংসারিক জীবনে আত্মীয় স্বজনের সেবা করিতে করিতে এই সমুচ্চ সিদ্ধিলাভ করা যায় না, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই গীতা এখানে "যতি" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সহিত যোগসাধনা করিয়া যাঁহারা আত্মজয়ের প্রয়াস করিতেছেন তাঁহারাই যতি, তাঁহারাই কাম-ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

সাধারণ সাংসারিক জীবনের মূলনীতি হইতেছে অহংয়ের বাসনা কামনার তৃপ্তি। সেখানে মানুষ কাম ও ক্রোধ হইতে বিযুক্ত নহে, মুক্ত নহে; পরন্তু যাহারা শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী সে-সবকে যতদূর সম্ভব সংযত করে তাহারাই হয় ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান। কিন্তু গীতার আদর্শ ইহা হইতে অনেক উর্দ্ধে—গীতা পুনঃ পুনঃ জোরের সহিত বলিয়াছে, কাম ক্রোধ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত না হইলে প্রকৃত মুক্তি নাই —শুধু কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করা নহে, প্রকৃতির এমন রূপান্তর সাধন করিতে হইবে যেন কাম ক্রোধ উৎপন্ন না হয়। কাম ও ক্রোধের বিয়োগ বলিতে তাহাদের অনুৎপত্তি বুঝায়। ইহা অনেক সাধনাসাপেক্ষ। বিষয়ভোগের মধ্যে মগ্ন থাকিয়া এ সাধনা হয় না। আবার সকল ভোগ্য-বিষয় হইতে সরিয়া নির্জ্জন বনে বা পর্ব্বতগুহায় থাকিয়াও এ-সাধনা হয় না, কারণ সেখানে কাম ক্রোধের নিমিত্তের অভাবে তাহাদের প্রকাশ না হইলেও প্রকৃতির মধ্যে তাহাদের বীজ থাকিয়া যায়, সুযোগ পাইলেই তাহারা আত্মপ্রকাশ করে। কামিনী, কাঞ্চন, যশ, মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি—এ-সবের দিকে মানুষের প্রাণসত্তার প্রবল টান রহিয়াছে, এই টান দূর করিতে না পারিলে অধ্যাত্ম জীবনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ইন্দ্রিয়গণের আপন আপন ভোগ্য বিষয়ে রাগ দ্বেষ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত (৩।৩৪); যে-জিনিষটি ভাল লাগে সেইটিকে ধরিবার জন্য, পাইবার জন্য ইন্দ্রিয়সকল মনকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে, আর মন যদি তাহাতে সায় দেয় তাহা হইলেই মোহ উপস্থিত হয়, আত্মজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হয় (২।৬৭)। সংসারে মানুষ স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয় স্বজন, বিষয় সম্পত্তি লইয়া জীবন যাপন করে—সেখানে তাহার চারিদিকে অহংয়ের তৃপ্তির,

কামনাতৃপ্তির দ্রব্য সকল সাজান রহিয়াছে—এই পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়া সে অহংভাব জয় করিবে ইহা দুরাশা—কারণ এখানে জীবনের কেন্দ্রই হইতেছে অহং, অহংয়ের লাভ অলাভ, সুখ দুঃখ, মান অপমান—এই সব লইয়াই মানুষের সাধারণ জীবন। এই অহংকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইলে, যাহা কিছুর সহিত অহংয়ের সম্বন্ধ আছে সে-সবকে একদিন নির্ম্মমভাবে ছাড়িতেই হইবে, অহংভাব লইয়া কোন কর্ম্ম করা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে—অতএব এই সাধনার পথে যাহারা অগ্রসর হইতে চায় তাহাদের পক্ষে "সুখের সংসার" ছাড়িয়া যাইতেই হইবে—এ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদেব শিক্ষার সহিত গীতার শিক্ষার কোন অমিল নাই। গীতা নিজেই বলিয়াছে,

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ১৮।৪৯

গীতা জ্ঞানের সাধন বলিয়াছে—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈবাগ্য, অহংভাবশূন্যতা, সংসাবের অনিত্যস্বরূপ উপলব্ধি করা, স্ত্রীপুত্রগৃহাদিতে আসক্তিশূন্য হওয়া, ইষ্ট বা অনিষ্ট যাহাই হউক তাহাতে সমভাব বক্ষা করা, নির্জ্জন স্থানে থাকা, সর্ব্বদা অধ্যাত্ম বিষয়ে চিন্তা করা, তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান করা (১৩।৮-১১)। সংসার-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া এই সাধনা করা অতিশয় কঠিন। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণেব সহজ সরল কথাগুলি খুবই মর্ম্মস্পর্শী। সংসার না ছাড়িলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, এ-কথা বলিলে লোকে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে তাই তিনি বলিতেন—"পাঁকাল মাছের মত থাক। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। ঈশ্বরেব উপর মন ফেলে বেখে সংসারের কাজ কর। কিন্তু বড় কঠিন। যে ঘবে আচার, তেঁতুল আর জলের জালা, সেই ঘরে বিকারের রোগী। কেমন করে বোগ সাবৃবে? আবাব তেঁতুল মনে করলে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার ও তেঁতুলের মত। আর বিষয়তৃষ্ণা সর্ব্বদাই লেগে আছে; ঐটি জলের জালা। এ তৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব। বড় কঠিন। সংসারে নানা গোল।...চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম করে যদি কেউ সোনা পায় সে মাটির ভিতর রাখ্‌তে পারে, জলের ভিতরও রাখতে পারে—সোনার কিছুই হয় না। আমি বলি, অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। কাঁচা মনকে সংসারে রাখ্‌তে গেলে মন মলিন হয়ে যায়; জ্ঞান লাভ করে তবে

সংসারে থাকৃতে হয়। শুধু জলে দুধ রাখ্‌লে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখ্‌লে আর কোনও গোল থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার-সমুদ্রে কাম-ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নাম্‌লে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য—হলুদ।"

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণ শঙ্করের ন্যায় মায়াবাদী নহেন—শঙ্করের মতে জ্ঞান বৈরাগ্য লাভের পর আর সংসার নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, জ্ঞান বৈরাগ্য লাভ না করিয়া লোকে সংসারে থাকে বলিয়াই দুঃখ পায়, নতুবা এই সংসারই হয় "বিদ্যার সংসার", শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ * এবং বস্তুতঃ এইটিই হইতেছে গীতার শিক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তা হলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এ-সবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়্‌বে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের উপর খুব জোর দিয়াছেন—বলিয়াছেন, এই দুটি বিঘ্ন, ইহারা ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, তিনি বুঝি সংসারত্যাগেরই শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার মত এই যে, যাহারা অজ্ঞানের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, বিকারের রোগী, তাহাদের পক্ষেই তেঁতুল ও আচারের ন্যায় কামিনীকাঞ্চন অনিষ্টকর। "যে মন ভগবানকে দিতে হবে, সেই মনের বার আনা মেয়েমানুষে নিয়ে ফেলে। তারপর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই খরচ হয়ে যায়। তা হলে ভগবানকে আর কি দিবে?" একবার জ্ঞান হইলে, ঈশ্বরলাভ হইলে আর কামিনীকাঞ্চন হইতে কোন ভয় থাকে না—তখন স্ত্রীলোক কি বস্তু তাহা বোঝা যায়, টাকারও সদ্ব্যবহার করা যায়—এইরূপ দিব্য জীবন বা "বিদ্যার সংসারই" শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ † এবং এইটি গীতারও আদর্শ।

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,

এই সংসার মজার কুটি
আমি খাই দাই আর মজা লুটি।

† শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন। এঁরা দুখানা তলোয়ার ঘুরাতেন—একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্ম্মের।"

কিন্তু সাধারণ সাংসারিক জীবনের মধ্যে থাকিয়া ভগবানকে লাভ করা অতিশয় কঠিন, এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। এইখানে সন্ন্যাসীদের শিক্ষার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার এবং গীতার শিক্ষারও বেশ মিল রহিয়াছে।

"ভগবান লাভ কর্‌তে গেলে তীব্র বৈরাগ্য দরবার। যা ঈশ্বরের পথের বিরুদ্ধ বলে বোধ হয়, তা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর্‌তে হয়। পরে হবে বলে ফেলে রাখা উচিত নয়। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরেব পথের বিরোধী। ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। ঢিমে তেতালা হলে হবে না। যে ত্যাগ করবে, তার খুব মনের বল চাই।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী)। 'যতীনাং যতচেতসাম্' বলিতে গীতা এইরূপ যত্নশীল দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত সাধকই বুঝিয়াছে। এইরূপ বৈরাগ্যসাধনের জন্য সাধারণ সাংসারিক জীবন হইতে, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, সম্পত্তি হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া কৌপীন ধারণ করিয়া ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে হইবে তাহা নহে। দুই চারিজন লোকের প্রকৃতির পক্ষে এরূপ সন্ন্যাসের সাধনা উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু ইহা অতি কষ্টকর পন্থা (৫।৬) এবং অধিকাংশের পক্ষেই উপযোগী নহে, প্রয়োজনীয়ও নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—'যে-কালে যুদ্ধ কর্‌তেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, ক্ষিদে, তৃষ্ণা, এ-সবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়ত খেতেই পেলে না, তখন ঈশ্বর টিশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ করে চল্‌লুম।' স্ত্রীটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বল্‌লে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, এই এক ঘরই ভাল,' তোমরা ত্যাগ কর্‌বে কেন? বাড়ীতে বরং সুবিধা; আহারের জন্য ভাব্‌তে হবে না, শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করবার লোক কাছেই পাবে।"

কিন্তু সংসারে যেমন এই সব সুবিধা আছে, সেখানে সাধনার বিঘ্নও কম নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তাহা হইলে উপায় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"উপায় আছে। তা সংসারে হবে না কেন? তবে কি জান মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাক্‌লে তবে ত ভগবানকে দেবে? মন বন্ধক দিয়েছ; কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধক! তাই সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ

দরকার। মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন ভজন হবে। সর্ব্বদাই গুরুর সঙ্গ, গুরুর সেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন।···মন কেমন জান? যেমন স্প্রীংয়ের গদী। যতক্ষণ গদীর উপরে বসে থাকা যায়, ততক্ষণই নীচু হয়ে থাকে, আর ছেড়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। তেমনি সৎ ও সাধুসঙ্গে ভগবানের ভাব যা কিছু লাভ কর, আবার সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌বামাত্র যে কে সেই—আপনার পূর্ব্বভাব ধারণ করে।····· ···বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না; সাধুসঙ্গ একদিন কর্‌লে হয় না, সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে।".

তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যদি সত্য সত্যই ভবব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে হয়, ভগবানকে লাভ করিয়া এই অবিদ্যা ও অজ্ঞানের সংসারকে বিদ্যার সংসারে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব এই অবিদ্যার সংসারের প্রতি মায়া কাটাইতেই হইবে, যে-মন স্ত্রী পুত্র পরিজনের নিকট, কামিনী-কাঞ্চনের নিকট বন্ধক দিয়াছি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মন নানা ভোগ্যবস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হইলে বিবেকরূপ ডাঙ্গস্ মারিয়া তাহাকে স্থির করিতে হইবে—আর এই কঠিন সাধনায় গুরুর সঙ্গ, গুরুর সাহায্য, গুরুর কৃপা অপরিহার্য্য। স্বগৃহ ছাড়িয়া সদ্গুরুর সাধন-আশ্রমে গিয়া বাস করিতে হইবে—কারণ সর্ব্বদাই গুরুরূপ বৈদ্যের সাহায্য প্রয়োজন, রোগ যে লাগিয়াই আছে। যে-মন লইয়া, কর্ম্মশক্তি লইয়া স্বার্থ চিন্তা করিতেছি, স্ত্রীপুত্রের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি—সে-সব শুধু ভগবদ্ চিন্তায় ও গুরুর আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত করিতে হইবে, আমার বলিতে ধনসম্পত্তি যাহা কিছু আছে, নিজের ভোগের জন্য না রাখিয়া গুরুর নির্দ্দেশ মত ভগবৎকার্য্যে উৎসর্গ করিতে হইবে, নিজের দেহ, প্রাণ, মন, সম্পত্তি সবই ভগবান জ্ঞানে গুরুকে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। সাধন অবস্থায় ইহা প্রয়োজন, সিদ্ধি লাভের পর যেখানেই থাক আর যাহাই কর—তুমিও আর কখনও ভগবানকে ছাড়িবে না, ভগবানও আর কখনও তোমাকে ছাড়িবেন না,

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি। ৬।৩০

শ্রীরামকৃষ্ণ চারাগাছের দৃষ্টান্ত দিয়া এইরূপ সাধনারই ইঙ্গিত করিয়াছেন—"সংসারের ভিতর—বিশেষ কর্ম্মের মধ্যে থেকে প্রথমাবস্থায় মন স্থির কর্‌তে অনেক ব্যাঘাত হয়। যেমন ফুটপাথের গাছ। যখন চারাগাছ থাকে তখন বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়,

গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। তখন গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।"

অনেকেই আপত্তি করেন যে, এইভাবে স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিলে কর্ত্তব্যের হানি হয়; ভগবানের ইচ্ছাতেই আমরা স্ত্রীপুত্র পাইয়াছি সে-সব ছাড়িয়া গেলে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া হয় না কি? শ্রীরামকৃষ্ণ এই-সব অজ্ঞানপ্রসূত প্রশ্নের বেশ উত্তর দিয়াছেন—"সব্বাই সংসার ত্যাগ করবে কেন? আর তাঁর কি ইচ্ছা যে, সকলেই শিয়াল কুকুরের মত কামিনী-কাঞ্চনে মুখ থুব্‌ড়ে থাকে? আর কি কিছু ইচ্ছা তাঁর নয়? কোন্‌টা তাঁর ইচ্ছা কোন্‌টা অনিচ্ছা সব কি জেনেছো? তাঁর ইচ্ছা সংসার করা, তুমি বল্‌ছো। যখন স্ত্রী-পুত্র মরে, তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখ্‌তে পাও না কেন? যখন খেতে পাও না, তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখ্‌তে পাও না কেন?"

বস্তুতঃ লোক স্ত্রীপুত্রের প্রতি আসক্তির বশে সংসার ছাড়িতে চায় না, কিন্তু মুখে বলে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতেছে। ভগবানের ইচ্ছাতেই আমরা সংসার পাতি এটা ঠিকই; ইহার ভিতর দিয়া আমাদের অভিজ্ঞতা হয়, আত্মবিকাশে সহায়তা হয়। আবার সংসারে আমরা যে অশেষ শোক দুঃখ পাই, এবং হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া আমাদের "সুখের" সংসারকে শ্মশান করিয়া দিয়া যায় ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, আমরা এইরূপ অজ্ঞানের সংসারে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকি—ইহাও ভগবানের অভিপ্রায় নহে। ভগবানকে ভালবাসা, ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া—ইহাই মানব জীবনে ভগবানের প্রকৃত অভিপ্রায়, অনিত্যম্ অসুখম্ লোকমিমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। যতদিন না আমরা স্বেচ্ছায় এই ভোগাসক্তি ছাড়িয়া ভগবানের দিকে ফিরিব, ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সব কিছু বর্জ্জন করিব—ততদিন আমাদের শোক তাপ জরা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ নাই। আর যাহার মধ্যে ভগবানকে লাভ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তাহার সকল কর্ত্তব্যের শেষ হয়, সংসারের সকল ঋণ হইতে সে মুক্তি পায়—কারণ সংসারের সকল কর্ত্তব্যের বড় কর্ত্তব্য ভগবানকে লাভ করা। সকল কর্ত্তব্য, সকল ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া যদি আমরা ভগবানের শরণাপন্ন হই, ভগবান নিজে আমাদিগকে সকল ঋণ, সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দেন, তাঁর জ্ঞানের জ্যোতিতে আমাদের মন বুদ্ধিকে আলোকিত করেন, তাঁর শক্তিতে আমাদের সকল দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেন, তাঁর অনির্ব্বচনীয় প্রেমে

আমাদের সকল শোক তাপ বিদূরিত করিয়া আমাদের হৃদয়কে নিরতিশয় আনন্দে পূর্ণ করিয়া দেন।

সকলের পক্ষে স্ত্রীপুত্র ও গৃহ ত্যাগ করিয়া এইরূপ "যতি" হওয়া, ভগবানের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা সম্ভব নহে। তবে সংসারে সকলের মধ্যে থাকিয়াও নিজের মন প্রাণকে অধ্যাত্ম সাধনার জন্য, ভগবান লাভের জন্য প্রস্তুত করা যায়—এবং সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সংসারীদের সংসারধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য।* তবে তাহাদের বুঝা উচিত যে, স্ত্রীপুত্রের প্রতি, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিলে এবং গতানুগতিক ভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেই ভগবানকে লাভ করা যায় না, পাপ তাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায় না—ঐ সবের দ্বারা কেবল তামসিকতার কিছু ঊর্দ্ধে উঠা যায়। সংসারী লোকের জীবন হইতেছে সাধারণতঃ রাজসিক—অহং ও বাসনার বশ, সংসারের কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াই যাহারা সত্ত্বগুণকে প্রশ্রয় দেয়, সাত্ত্বিক ভাবকে বাড়াইয়া তোলে তাহারাই উচ্চতর গতির জন্য প্রস্তুত হয়—তখন সব ছাড়িয়া একান্তভাবে অধ্যাত্ম সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। যাহাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল তাহাদের পক্ষে জোর করিয়া সব ছাড়া উচিত নহে—তাহাতে প্রকৃতিকে নিগ্রহ করা হয়। তাহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে ভোগ করিতে করিতেই বিচার করা যে, এ-সব অসার অনিত্য—প্রকৃত সুখ, শান্তি, আনন্দ ইহাদের মধ্যে নাই, এ-সব ভোগ ছাড়িতেই হইবে। পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিবার সময় সর্ব্বদা চিন্তা করিতে হইবে যে, "আমার" সংসার, "আমি পালন করিতেছি," "আমার কর্ত্তব্য"—এ-সব হইতেছে অজ্ঞানের কথা, এ সংসারে কেহ কাহারও নহে, একমাত্র ভগবানই আমাদের আপন জন—তাঁহাকে পাইলে সংসারের সবাই আপনার হইয়া উঠিবে, তখন আর আপন-পর কোন ভেদ থাকিবে না—তখন শুধু একটি ক্ষুদ্র পরিবার নহে, পরন্তু আমাদের দ্বারা সর্ব্বভূতের হিত সাধিত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "বাঘ যেমন কপ্ কপ্ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনিই 'অনুরাগ বাঘ' কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কাম-ক্রোধাদি থাকে না।" কিন্তু আবার কাম

* প্রাচীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ইহাই লক্ষ্য ছিল।

ক্রোধাদি প্রবল থাকিলে ঈশ্বরে অনুরাগ হয় না—তাই অভ্যাস ও বিচারের দ্বারা তাহাদিগকে সংযত করিতে হয়। বাসনা কামনার মধ্যে আবার সবচেয়ে তীব্র কামনা হইতেছে কামিনী ও কাঞ্চনের কামনা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"কামিনী-কাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সেদিকে যেতে দেয় না।...যে স্ত্রী-সুখ ত্যাগ করেছে, সে ত জগৎ-সুখ ত্যাগ করেছে, ঈশ্বর তার অতি নিকট।" "সাধু সাবধান! কামিনী-কাঞ্চন থেকে সাবধান। মেয়ে মানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠ্‌বার জো নাই। বিশালাক্ষীর দ—যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না।" পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক যেমন সাধনার বিঘ্ন, স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষও তেম্নি সাধনার বিঘ্ন—যে স্ত্রীলোক অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে চায়, তাহার কর্ত্তব্য হইতেছে কোন পুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠতা না করা।

বস্তুতঃ স্ত্রী বা পুরুষ কেহই প্রকৃত শত্রু নহে, প্রকৃত শত্রু হইতেছে আমাদেরই ভিতরের কাম। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের সহবাসে, পরস্পরের সহিত নানাপ্রকার রমণে যে সুখ পায় তাহার প্রতি তাহাদের প্রাণসত্তার আছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা—বিচারের দ্বারা এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা এই সুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে—কারণ ইহা মানুষকে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হইতে বিমুখ করে। বিচার করিতে হইবে, "কি ভোগ সংসারে কর্‌বে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ—এই আছে, এই নাই। প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগে আছে, সূর্য্য দেখা যায় না। দুঃখের ভাগই বেশী। আর কামিনী-কাঞ্চন মেঘ সূর্য্যকে দেখ্‌তে দেয় না।" প্রাণ স্ত্রীসঙ্গের জন্য লালায়িত হইলেই যে তাহাতে সায় দিতে হইবে এমন কথা নাই। ছোট ছেলেরা কত জিনিষের জন্য আবদার করে, না পাইলে কাঁদে—অন্যায় অনিষ্টকর জিনিষের জন্য আবদার করিলে কি তাহাতে সায় দিতে হইবে? আমাদের অজ্ঞান প্রাণের কান্নাকে অজ্ঞান বালকের কান্নার মত বুঝাইয়া শান্ত করিতে হইবে। মেয়েদের মোহিনী শক্তি আছে, পুরুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে—সে আকর্ষণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলে চলিবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"খুব বীরপুরুষ হবি। ঘোম্‌টা দিয়ে কান্নাতে ভুলিস্‌ না। সিক্‌নি ফেল্‌তে ফেল্‌তে কান্না! ভগবানেতে মন ঠিক রাখ্‌বি। যে বীরপুরুষ সে 'রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ'।"

আর স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের প্রতি আমাদের যে স্নেহ ভালবাসা সেটিকেও অজ্ঞান মায়া বলিয়াই বিচার করিতে হইবে। মানুষ "আমার" "আমার" করে বলিয়াই সংসারে এত দুঃখ পায়। নিজের ছেলেকে যদি পরের ছেলের মত ভাবা অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে সংসারী লোককে পুত্রশোকে এত ব্যথা পাইতে হয় না। সংসারের মধ্যে থাকিয়াই কেমন করিয়া ভগবান লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়—গীতায় তাহার অনেক ইঙ্গিত আছে, তাহার একটু অভ্যাস করিতে পারিলেও অনেক লাভ হয়। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলি খুবই পরিচিত, তথাপি বহুল প্রচারের জন্য তাহাদের কতকগুলি এইখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—কারণ সংসারী লোকের পক্ষে এই উপদেশগুলি বিশেষ সাহায্যপ্রদ।

"সংসারাসক্ত জীবের হুঁস্ নাই। তারা জালে পড়েই আছে। অথচ জালে বদ্ধ হয়েছি এরূপ জ্ঞান নাই। যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, আবার তারা তাই করে। এদিকে ছেলে মারা গেছে শোকে কাতর, মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হলো, আবার বছর বছর ছেলে মেয়ে হবে। বলে, কি কর্‌বো অদৃষ্টে ছিল। তীর্থ কর্‌তে গেলেও ঈশ্বরচিন্তা করবার অবসর পায় না। কেবল পরিবারদের পুঁটুলি বইতে বইতে প্রাণ যায়। ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে আর গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধ জীব নিজের ও পরিবারের পেটের জন্য দাসত্ব করে, আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ করে' ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন, বদ্ধ জীব তাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়। সংসারাসক্ত বদ্ধ জীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপ্‌লে, গঙ্গাস্নান কর্‌লে, তীর্থে গেলে কি হবে?"

"তোমরা তো নিজে দেখ্‌ছো, সংসার অনিত্য। যাদের এত 'আমার' 'আমার' কর্‌ছো, চোক বুজলেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হল না! আমার হারুর কি হবে?" 'গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পলাতে নারে।' গুটী পোকা আপন নালে আপনি মরে। এরূপ সংসার মিথ্যা, অনিত্য। তাঁকে জেনে সংসার কর্‌লে অনিত্য নয়।"

"সংসার কর না কেন? তাতে দোষ নাই; তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর। জেনো যে, বাড়ী, ঘর, পরিবার আমার নয়; এসব ঈশ্বরের; আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে

সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌বে।" "তাঁর মায়াতেই আমি কর্ত্তা বোধ হয়, আর 'আমার' এই সব—স্ত্রীপুত্র, ভাই-ভগিনী, বাপ মা, বাড়ী ঘর—এ সব 'আমার' বোধ হয়। সংসারাশ্রম ভোগের আশ্রম। আর কামিনী-কাঞ্চন ভোগ কি আর কর্‌বে?" "সকলের পক্ষে সংসারত্যাগ নয়, যাদের ভোগান্ত হয় নাই, তাদের পক্ষে সংসারত্যাগ নয়। তারা নিষ্কাম কর্ম্ম করবার চেষ্টা কর্‌বে। বিচার কর্‌তে কর্‌তে সংসারের কোন বিষয়টা ভোগ কর্‌তে গেলেই যে মন ঐ বিষয় ত্যাগ করবে এ-কথা নিশ্চিত। দু একটী ছেলে হলে স্ত্রী পুরুষ দুই জনে ভাই বোনের মত থাকবে। আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌বে, যাতে ইন্দ্রিয়সুখেতে মন না যায়।"

"সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নাই। যে সয়, সেই রয়; যে না সয়, সে নাশ হয়। যেমন কামারবাড়ীব লাইয়েব উপর কত জোর করে বড় হাতুড়ী পেটে, তবুও কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। যে যাই বলুক ও যাই করুক না কেন, সব সহ্য করে নেবে।"

"যেমন সাপ দেখ্‌লে লোকে বলে থাকে, মা মনসা, মুখটি লুকিয়ে রেখো আর ল্যাজটি দেখিও, তেমনি যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে 'মা' বলে নমস্কার করবে তার তাদের মুখের দিকে না চেয়ে পায়ের দিকে চাইবে, তা হলে আর পতনের ভয় থাকবে না।" "স্বামী বর্ত্তমানে যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সে তো নারী নয়,—সাক্ষাৎ ভগবতী।"

"দেখ, অর্থ যার দাস সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়েও মানুষ নয়, মানুষের আকৃতি, কিন্তু পশুব ব্যবহার। 'বিদ্যার সংসারের' জন্য বেশী অর্থ উপায়ের চেষ্টা করবে—কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জ্জন করা উদ্দেশ্য নয়, ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টাকায় দোষ নাই।"

"স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা,—তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। ঈশ্বর দর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।"

"তাঁকে চিন্তা যত কর্‌বে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে ততই বিষয়-বাসনা কম পড়ে আস্‌বে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কম্‌বে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে; নিজের স্ত্রীকে ধর্ম্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে; পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব

আস্‌বে ; সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাক, জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে।" এই সবই হইতেছে গীতার শিক্ষার সার।

অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং—শঙ্কর "অভিতঃ" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ, অর্থাৎ যাঁহারা কাম ক্রোধ হইতে বিযুক্ত সংযতচিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরে উভয়তঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।* এরূপ ব্যক্তি যে জীবন্মুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই! কিন্তু "অভিতঃ" শব্দের এইরূপ "উভয়তঃ" অর্থ করা কষ্টকল্পনা কারণ ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ হইতেছে, চতুর্দ্দিকে। চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান থাকে—এ কথার তাৎপর্য্য কি ঠিক করিতে না পারিয়া অনেকেই অনেক রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে নির্ব্বাণ সুলভ ; রামানুজ বলিয়াছেন, নির্ব্বাণ তাঁহার হস্তস্থিত। ইহারই অনুসরণে তিলক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নির্ব্বাণ করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে! কিন্তু গীতার মর্ম্ম উপলব্ধি করিলে এই সব কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয় না। গীতার মতে নির্ব্বাণ হইতেছে ব্রহ্মচৈতন্য ; ইহা লাভ করিতে আমাদিগকে সংসার ছাড়িয়া, জগৎ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে হয় না, কারণ আমাদের মধ্যেই ইহা রহিয়াছে, আবার আমরা ইহার মধ্যে রহিয়াছি—অভিতঃ বর্ত্ততে †। ইহা যে আমাদের ছিল না, এখন লাভ হইবে তাহা নহে—ইহা নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, কেবল অজ্ঞান অহংভাবের আবরণে লুক্কায়িত রহিয়াছে—সেই আবরণ দূর হইলেই ইহা ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়—আমরা তখন সেই দিব্য চৈতন্যের মধ্যে থাকিয়া জীবনযাপন করি, কর্ম্ম করি। আমাদের ভিতরে যে আত্মা রহিয়াছে, যাহা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পরম আত্মা তাহাই এই নির্ব্বাণ, আবার বিশ্বের যে পরম আত্মা, সর্ব্বভূতের পরম আত্মা তাহাও এই নির্ব্বাণ। সেই আত্মায় বাস করিয়া আমরা সকলের মধ্যে বাস করি, শুধু আর আমাদের অহংয়ের মধ্যে নহে ; সেই আত্মার সহিত এক হওয়ায় বিশ্বের সব কিছুর

---

* জীবিত অবস্থাতেই যদি তাহাদের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে তবে আবার মৃত্যুর পর, উভয়তঃ, কি মোক্ষলাভ হইবে ?

† আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। ছান্দোগ্য—৭।২৫।২

সহিত অবিচল একত্ব আমাদেব সত্তার স্বরূপ হইয়া উঠে, তাহাই হয় আমাদের কর্ম্মময় চৈতন্যের ভিত্তি এবং আমাদের সকল কর্ম্মের মূল প্রেবণা।

গীতা 'অভিতঃ' শব্দটির দ্বারা যাহা বুঝাইয়াছে তাহার জন্য উপনিষদ 'সর্ব্বতঃ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে,

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং
 স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।
সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
 কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীবা
 যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥
—মুণ্ডকোপনিষদ, ৩।২।৪,৫

—"তিনি এই সব উপায়ে প্রযত্ন করিয়া জ্ঞানলাভ করেন; তাঁহার এই আত্মা তাহার পবম ধামে প্রবেশলাভ কবে। বীতবাগ প্রশান্ত ঋষিগণ তাঁহাকে লাভ করিয়া, জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়া, তাঁহাদের অধ্যাত্ম সত্তাকে গঠন করিয়া, আত্মাব সহিত যোগে সর্ব্বগত ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বের মধ্যে প্রবেশ করেন।"

বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্। আত্মাকে জানা, আত্মাকে লাভ করাই হইতেছে গীতার মতে নির্ব্বাণে বর্ত্তমান থাকা। ইহা হইতেছে নির্ব্বাণ তত্ত্বের উদার প্রসারণ। বৌদ্ধগণেব মধ্যে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে মোটামুটি চারি প্রকার * মত দেখা যায়। প্রথম, নির্ব্বাণে সর্ব্বসত্তার লোপ হয়। নির্ব্বাণ শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতেই বোধ হয় এই মতেব উদ্ভব হইয়াছিল, কারণ নির্ব্বাণেব পর কি থাকে না থাকে বুদ্ধ এ প্রশ্নেব কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, নির্ব্বাণে সকল চৈতন্যের লোপ হয়—শুধু প্রাণহীন, চৈতন্যহীন, জড় সত্তা থাকে। তৃতীয় মতানুসারে নির্ব্বাণের পব যাহা থাকে তাহা অনির্ব্বচনীয়, সেই জন্যই বুদ্ধ সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। চতুর্থ মতানুসারে নির্ব্বাণে সুখদুঃখময় সাধারণ মানস চৈতন্যেরই লোপ হয়, কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য বা বিজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। সকল বৌদ্ধেরই মত যে, নির্ব্বাণে বাসনা, কামনা, অহংভাব, অজ্ঞানের লোপ হয়। গীতা দেখাইয়াছে, সাধনার দ্বারা এইরূপ অবস্থা লাভ

* পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

করিলে মানুষ আত্মাকে জানিতে পারে, আত্মাই হইয়া উঠে এবং তাহাই নির্ব্বাণ। তখন যে সংসার বা সংসারের কর্ম্ম বিলুপ্ত হয় না—স্বয়ং বুদ্ধের জীবনই তাহার প্রমাণ।* তবে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধ জীবিতাবস্থায় নির্ব্বাণ লাভ করেন নাই, নির্ব্বাণের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তিনি জীবের প্রতি করুণার বশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—অন্য সকল অজ্ঞানবদ্ধ জীবকে নির্ব্বাণের পথ দেখাইবার জন্য। যাহাই হউক, ইহা গীতার মত নহে; গীতার মতে সংসার ও সংসারের কর্ম্মের সহিত নির্ব্বাণের কোন বিরোধ নাই। "রিপুগণের সকল কলুষ হইতে মুক্তি, এই মুক্তির ভিত্তিস্বরূপ সমতা ও আত্মজয়, সর্ব্বভূতেষু, সর্ব্বভূতের প্রতি সমভাব এবং সকলের জন্য কল্যাণকর প্রেম, যে সংশয় ও মোহ আমাদিগকে সর্ব্ব-ঐক্যসাধক ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে তাহার চরম নিরসন এবং আমাদের মধ্যে এবং সকলের মধ্যে যে এক অদ্বিতীয় আত্মা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান—এই সব হইতেছে নির্ব্বাণের পক্ষে প্রয়োজনীয়, এই-সবকে লইয়াই নির্ব্বাণ এবং ইহারাই নির্ব্বাণের সারবস্তু, গীতার এই শ্লোকগুলি হইতে ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

অন্বয়—বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব (কৃত্বা) নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ মুনিঃ যঃ সঃ সদা মুক্তঃ এব।

অনুবাদ—বাহ্য স্পর্শসকল নিজের বাহিরে রাখিয়া, দৃষ্টিকে ভ্রূমধ্যে নিবদ্ধ করিয়া, নাসিকার অভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করিয়া মোক্ষপরায়ণ যে-মুনি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ বর্জ্জন করিয়াছেন তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত।

---

* বুদ্ধ বোধিলাভের পর ৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন—এবং নানা স্থানে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার ও সংঘস্থাপন করিয়াছিলেন। আশী বৎসর বয়সে মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ কয়দিন পর্য্যন্ত তিনি কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান অতি স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন যে, কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ ভাল। অথচ গীতার অনেক ব্যাখ্যাকার এই অধ্যায়টিকে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ নামে অভিহিত করিয়াছেন, যেন এই অধ্যায়ে কর্ম্মসন্ন্যাসেরই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে! শঙ্করাদি সন্ন্যাসিগণ কর্ম্মসন্ন্যাসেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চান, সেই দৃষ্টি লইয়াই তাঁহারা এই অধ্যায়টিতে তাঁহাদের নিজ মতেরই সমর্থন খুঁজিয়াছেন এবং তদনুসারে শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, কর্ম্মযোগের প্রশংসা প্রথমেই করিয়া গীতা যে ভাবে এই অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছে তাহাতে মনে হইতে পাবে যে গীতা কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগকেই বড বলিয়াছে, এবং সাধারণতঃ জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস একই বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ গীতা কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগকে পৃথক কবিয়া দেখে নাই, এই অধ্যায়ের প্রথমেই স্পষ্টভাবে বলিয়াছে যে যাহারা বালকের ন্যায় অল্পবুদ্ধি তাহারাই এই দুইটিকে পৃথক বলিয়া মনে করে (৫।৪)। গীতা এই অধ্যায়ে জ্ঞানের উপর জোর দিয়াছে তাহার কারণ আত্মজ্ঞান না হইলে কর্ম্মযোগ পূর্ণতা লাভ করে না। সাধারণতঃ কর্ম্মসন্ন্যাস বলিতে বাহ্য কর্ম্মত্যাগ বুঝায়, শঙ্করাদি সন্ন্যাসিগণ তাহাই বুঝিয়াছেন—কিন্তু গীতা এইরূপ বাহ্য কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগকেই শ্রেয়ঃ বলিয়াছে। তবে গীতার মতে প্রকৃত কর্ম্মসন্ন্যাস হইতেছে আভ্যন্তরীণ—সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে সংন্যস্ত করিয়া আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা (৫।১০)—এবং ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ, যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং। পঞ্চম অধ্যায়ে এই ভাবে সন্ন্যাস ও যোগকে এক করা হইয়াছে, ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই তাহা বলা হইয়াছে। শঙ্কর কিন্তু গীতার এই সূক্ষ্ম সমন্বয়টি দেখেন নাই—তিনি এই অধ্যায়ে বাহ্য কর্ম্মত্যাগেরই শিক্ষা দেখিতে পাইয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া এই অধ্যায়ের ২৭ ও ২৮ শ্লোক হইতে তিনি নিজ মতের সমর্থন পাইয়াছেন বলিয়া জোর দিয়াছেন। এই দুইটি শ্লোকের ভাষ্যের উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন—"কর্ম্মযোগ হইতে ক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি, তাহা হইতে জ্ঞান ও সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগ এবং তাহা দ্বারা মোক্ষ—এই কথা ভগবান পদে পদে বলিয়াছেন ও বলিবেন।" বস্তুতঃ এই কথা শঙ্করাচার্য্য নিজেই পদে পদে বলিয়াছেন ও বলিবেন, ভগবান গীতায় কুত্রাপিও এ-কথা বলেন নাই যে, জ্ঞান হইলেই সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ হয়

এবং সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ না করিলে মোক্ষ লাভ হয় না। শঙ্করের মতটি প্রকৃতপক্ষে গীতার মত নহে পাছে পাঠকের মনে এই সন্দেহ হয় তাই তিনি এখানে জোর দিয়া বলিলেন—"ভগবান পদে পদে এই কথা বলিয়াছেন ও বলিবেন।"

আর এইরূপ জোর দিবার সুযোগও তিনি এই দুইটি শ্লোকে বেশ পাইয়াছেন। এখানে যে সাধনার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া সমাধির ভিতর দিয়া মোক্ষ লাভের প্রযত্ন করা। শঙ্করের যুক্তি এই যে, এতক্ষণ কর্ম্মযোগের কথা বলিয়া ভগবান এইবারে কর্ম্মত্যাগ ও জ্ঞানযোগের অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বলিতেছেন। প্রথমে কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তাহার পর কর্ম্মত্যাগ ও জ্ঞানযোগ। কিন্তু বস্তুতঃ এই দুইটি শ্লোকে যেমন কর্ম্মযোগের কথা বলা হয় নাই, তেমনই জ্ঞান-যোগেরও কথাও বলা হয় নাই—এই দুইটি শ্লোকে যাহা সূচিত হইয়াছে তাহা হইতেছে খাঁটি রাজযোগ। জ্ঞানযোগের সাধনা হইতেছে শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন—আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া তাহা মনে রাখিতে হইবে এবং গভীরভাবে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, আত্ম অনাত্ম বিচার করিতে হইবে। কিন্তু এখানে বলা হইতেছে চিত্ত ও মনের সমস্ত ক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করিতে, এবং সেজন্য প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে। যদি বলা যায় যে, এইভাবে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিয়াই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, অতএব ইহা জ্ঞান যোগেরই একটি অন্তরঙ্গ সাধন—তাহা হইলে সমানভাবেই বলা যাইতে পারে যে, ইহা কর্ম্মযোগেরও অন্তরঙ্গ সাধন—কর্ম্মযোগকে পূর্ণ করিতে হইলে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইতে হয়; কিন্তু মন যদি সর্ব্বদা বাহ্য বিষয়ের দিকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ধাবিত হয় তাহা হইলে এই নিষ্কামতা ও অনাসক্তি সম্ভব হয় না—তাই গীতা আত্মসংযমের একটি শক্তিশালী প্রণালী হিসাবে এখানে রাজযোগের উল্লেখ করিয়াছে। গীতা তৎকালে প্রচলিত কোন সাধনাকেই অবহেলা করে নাই, ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রকৃতির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রণালী উপযোগী হয়। সেই জন্য গীতা আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞানলাভের উপায়রূপে যেমন বৌদ্ধগণের নির্ব্বাণ সাধনার উল্লেখ করিয়াছে, তেমনি তদনুরূপ রাজযোগের চিত্তবৃত্তি নিরোধেরও উল্লেখ করিয়াছে। কিন্তু এ-সবেরই লক্ষ্য হইতেছে কর্ম্মযোগকেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলা। গীতা পরের শ্লোকেই তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছে এবং সেইটিই হইতেছে এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক।